ইসলামী শরীয়তের মৌলিক নীতিমালা

أصول الشريعة الإسلامية

সঞ্চয়নে----
আব্দুল হামীদ আল-ফাইযী আল-মাদানী

অবতরণিকা

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين....وبعد:

ইসলামী শরীয়তের বিধান নির্ধারণে রয়েছে নানা মৌলিক নীতিমালা। তালেবে ইল্‌ম যদি সেগুলির অনুসরণ করে, তাহলে কুরআন-সুন্নাহ বোঝা, শরীয়তের বিধান নির্ধারণ করা ও ফতোয়া প্রদান করার ক্ষেত্রে সমস্যা বা বিভ্রান্তিতে পড়তে হয় না।

এমনিতে এক-এক মযহাবের নিজস্ব নীতিমালা আছে। কিন্তু সবচেয়ে সুন্দর নীতিমালা হল আহলুল হাদীসের নীতিমালা। আমি বক্ষমাণ পুস্তিকায় তাঁদেরই নীতিমালা পরিবেশন করার চেষ্টা করেছি।

এ বিষয়ে যে সকল গ্রন্থের সহযোগিতা নিয়েছি, তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল, যাকারিয়া বিন গুলাম ক্বাদির সাহেব প্রণীত 'উসূলুল ফিক্বহ আলা মানহাজি আহলিল হাদীষ'।

কোন কোন নীতির ক্ষেত্রে মতভেদ থাকা স্বাভাবিক। আমি তা এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করেছি।

অনেক ক্ষেত্রে নীতির উদাহরণ উল্লেখ করা সম্ভব হয়নি। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সংক্ষেপ করার কথা মাথায় নিয়ে অগ্রসর হয়েছি। এমতাবস্থায় বিস্তারিত জানার জন্য তালেবে ইল্‌মকে বড় বড় গ্রন্থ পড়ার অনুরোধ করছি।

যাঁরা বাংলা-ইংরেজিতে দ্বীন শিক্ষা করেন, তাঁদের ক্ষেত্রেও এ সকল নীতিমালা দ্বীন বুঝতে অনেকটা সাহায্য করবে বলে আমার বিশ্বাস। এই বিশ্বাস আছে একজন দ্বীনী ভাইয়ের। তাঁরই অনুপ্রেরণায় এই পুস্তিকার অবতারণা।

মহান আল্লাহ তাঁকে, আমাকে, প্রকাশককে ও সকল পাঠককে সঠিক দ্বীন বুঝে আমল করার তওফীক দান করুন। আমীন।

বিনীত----

আব্দুল হামীদ আল-ফাইযী আল-মাদানী

আল-মাজমাআহ, সঊদী আরব

১৯/ ১২/ ৪২, ২৯/৭/২১

সূচিপত্র

অবতরণিকা
দলীল ১
ইজমা' ৮
কিয়াস ১০
রসূল ﷺ-এর কর্মাবলী ১৪
সাহাবীর উক্তি ২০
নাসেখ-মনসূখ ২২
পরস্পরবিরোধী দলীলের মাঝে সমন্বয় সাধনের নীতিমালা ২৩
শরয়ী শব্দার্থ বুঝা অপরিহার্য ২৫
আদেশসূচক বাক্য ২৬
নিষেধসূচক বাক্য ৩৪
আম-খাস ৩৬
ভাবার্থ ৪৫
শরয়ী বিধানসমূহের পাঁচটি মান ৪৭
ওয়াজেব ৪৭
মুস্তাহাব ৫২
মুবাহ ৫৪
মকরূহ ৫৫
হারাম ৫৬
মুসলিম নর-নারীর ক্ষেত্রে কতিপয় মৌলনীতি ৫৯
ইজতিহাদ ও তাক্বলীদ ৬২
বিবিধ ফিক্‌হী নীতিমালা ৬৯
বিদআতের নীতিমালা ৮৬
যে নীতিমালা দিয়ে হাদীসকে 'সহীহ' বলা যায় না ৯৩
যে নীতিমালা দিয়ে হাদীসকে 'যয়ীফ' বলা যায় না ৯৪

দলীল

দলীল হল শরয়ী বিধানের ভিত্তি ও প্রমাণ। এ প্রসঙ্গে রয়েছে নানা নীতি।

১নং নীতি

দলীল হচ্ছে প্রত্যেক মাসআলার বুনিয়াদ, যার উপর নির্ভর ক'রে বিধান নির্ধারিত হয়। দলীল ছাড়া ইবাদত বিদআত হয় এবং তা ছাড়া কোন বস্তু হারাম প্রমাণিত হয় না।

২নং নীতি

শরীয়তের বিধান গ্রহণ করতে হবে সহীহ হাদীস থেকে। কোন জাল বা যয়ীফ হাদীস থেকে বিধান গ্রহণ করা বৈধ নয়।

এই নীতির উপরই আমল ক'রে প্রত্যেক ইমাম বলেছেন, 'হাদীস সহীহ হলে, সেটাই আমার মযহাব।'

৩নং নীতি

যয়ীফ হাদীসের উপর আমল করার ক্ষেত্রে আকীদা, আহকাম বা ফাযায়েলের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। সর্বক্ষেত্রেই যয়ীফ হাদীস বর্জনীয়।

কিছু শর্তসাপেক্ষে কোন কোন আলেম ফাযায়েলে আমলে যয়ীফ হাদীস ব্যবহার বৈধ বলেছেন। কিন্তু সে শর্তাবলী পূরণ হওয়া কঠিন। সুতরাং সঠিক হল, মূলেই কোনও ক্ষেত্রে যয়ীফ হাদীস ব্যবহার না করা। (বিস্তারিত দ্রঃ বিদআত দর্পণ)

৪নং নীতি

দলীল বুঝতে হবে সলফে সালেহীনের বুঝ অনুপাতে।

যখন বুঝতে সমস্যা হয়, তখন অগ্রগামী সাহাবাগণের বুঝে কুরআন ও সুন্নাহ বুঝতে হবে। যেহেতু তাঁরা নবী ﷺ-এর সহচর এবং ওয়াহী অবতীর্ণ কালের শ্রেষ্ঠ জামাআত। তাঁদের প্রশংসায় এবং তাঁদের অনুগমনের মাহাত্ম্য বর্ণনায় মহান আল্লাহ বলেছেন,

{والسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ المهَاجِرِينَ والأَنْصَارِ والذِينَ اتَّبَعُوهم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ الله عَنْهُم وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُم جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الفَوْزُ

العَظِيمُ } [التوبة : ١٠٠]

"আর যেসব মুহাজির ও আনসার (ঈমান আনয়নে) অগ্রবর্তী এবং প্রথম, আর যেসব লোক সরল অন্তরে তাদের অনুগামী, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও তাঁতে সন্তুষ্ট। তিনি তাদের জন্য এমন উদ্যানসমূহ প্রস্তুত ক'রে রেখেছেন, যার তলদেশে নদীমালা প্রবাহিত; যার মধ্যে তারা চিরস্থায়ীভাবে অবস্থান করবে, এ হল বিরাট সফলতা।" (তাওবাহ ঃ ১০০)

মহানবী ﷺ বলেছেন,

((خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ)).

"সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হল আমার (সাহাবীদের যুগের) মানুষ। অতঃপর তৎপরবর্তী (তাবেয়ীদের) যুগ। অতঃপর তৎপরবর্তী (তাবে-তাবেয়ীনদের) যুগ।" *(বুখারী ২৬৫২, ৩৬৫১, ৬৪২৯, মুসলিম ৬৬৩৫নং)*

সুতরাং তাঁরাই হলেন আমাদের আদর্শ মানব। প্রত্যেক মুসলিমের উচিত, কিতাব ও সুন্নাহ বুঝতে তাঁদের অনুসরণ ও অনুগমন করা। যেহেতু তাঁরাই এ ব্যাপারে সবার চাইতে বেশি অভিজ্ঞ। তাঁরাই কিতাব ও সুন্নাহর উক্তির ব্যাখ্যা সম্বন্ধে সবার চাইতে বেশি বিজ্ঞ।

ইবনে আবী যায়দ কাইরাওয়ানী বলেন, 'সুন্নাহর সামনে আত্মসমর্পণ করা আবশ্যক। না কারো রায় দ্বারা তার বিরোধিতা করা যাবে, আর না কোন কিয়াস দ্বারা তা রদ্দ করা যাবে। যে সুন্নাহর ব্যাখ্যা সলফ সালেহ করেছেন, আমরা করব। যার আমল তাঁরা করেছেন, আমরা করব। যা তাঁরা বর্জন করেছেন, আমরা করব। তাঁরা যে বিষয় হতে বিরত হয়েছেন, সে বিষয় হতে বিরত হওয়া আমাদের জন্য প্রশস্ততা আছে। তাঁরা যেভাবে বিবৃতি দিয়েছেন, আমরা সেইভাবে অনুসরণ করব। তাঁরা হাদীস থেকে যে বিধান বা মত গ্রহণ করেছেন, তাতে আমরা তাঁদের অনুকরণ করব। যে বিষয়ে বা যার ব্যাখ্যায় তাঁরা মতবিরোধ করেছেন, সে বিষয়ে আমরা তাঁদের জামাআত থেকে বের হয়ে যাব না। আমি পূর্বে যে সব কথার উল্লেখ করলাম, তা হল আহলে সুন্নাহ ও ফিক্হ ও হাদীসে মুসলিমদের ইমামগণের কথা।' (জামে' ১১৭পৃঃ)

সামআনী বলেছেন, 'আমরা অনুসরণ করতে আদিষ্ট ও আহূত হয়েছি এবং আমাদের নব্য পথ আবিষ্কার (বিদআত) করতে নিষেধ ও তিরস্কার করা হয়েছে। আর আহলে সুন্নাহর প্রতীক হল, সলফে সালেহর অনুসরণ করা এবং

প্রত্যেক সেই বিষয় বর্জন করা, যা বিদআত ও নব্য আবিষ্কৃত।' *(স্বাওনুল মানত্বিক ১৫৮-পৃঃ)*

সতর্কতার বিষয় যে, কিতাব ও সুন্নাহ বুঝতে নিজ খেয়াল-খুশি, নিজ বুঝ, ভাষা বা অনুবাদের উপর নির্ভর, পছন্দমতো ব্যাখ্যা ও কিয়াস বা অনুমান প্রয়োগ করাতে অধিকাংশ মুসলিম ভ্রষ্ট হয়ে গেছে। সুতরাং সাবধান!

৫নং নীতি

দলীলের প্রকাশ্য ও স্পষ্ট উক্তিতে যা বুঝা যায়, তাই গ্রহণ করা ওয়াজেব। আর তার অপব্যাখ্যা না করা।

আহলে হাদীসের মানহাজ হল, সর্বক্ষেত্রে দলীলের বাতেনী অর্থ না খোঁজা এবং কোন বাধা না থাকলে তার প্রকাশ্য ও স্পষ্ট অর্থ অনুযায়ী আমল করা।

এর অর্থ যাহেরী হওয়া নয়। কারণ অন্য কোন স্পষ্ট দলীল থাকলে প্রকাশ্য অর্থ না নিয়ে ভিন্ন অর্থ নেওয়া যেতে পারে।

যেমন আসমা ও সিফাতের ক্ষেত্রে, তেমনই আহকামের ক্ষেত্রে, যে স্পষ্ট অর্থ বুঝা যায়, তাই আমাদের বিশ্বাস্য হবে, তাই মান্য হবে। এটাই সলফদের নীতি।

হাদীসে এসেছে, উটের মাংস খেলে উযূ করতে হবে। উযূর আভিধানিক অর্থ হল হাত ধোয়া। আর শরয়ী পারিভাষিক অর্থ হল উযূ করা। অনেকে ধারণা করেন, নবী ﷺ উটের গোশ্ত খেয়ে উযূ করতে বলেননি, বরং হাত ধুতে বলেছেন! এবং তাঁরা মনে করেন, উটের গোশ্ত খেলে উযূ ভাঙ্গে না।

তাহলে কি তিনি একই হাদীসে ছাগলের গোশ্ত খেয়ে হাত ধুতে নিষেধ করেছেন?

আসলে নিজেদের খেয়াল-খুশিমতো অর্থ গ্রহণ করলে ভ্রষ্টতায় নষ্ট হতে হয়। পক্ষান্তরে সলফদের নীতি অবলম্বন করলে আমল সহজ হয়ে যায়। বলা বাহুল্য, সলফরা উটের গোশ্ত খেলে উযূ করতেন। কেবল হাত ধুতেন, তা নয়। আর সেটাই হাদীসের স্পষ্ট ভাষ্য।

আল্লামা শানক্বীত্বী বলেছেন, 'সন্দেহহীন সঠিক পন্থা, যে পন্থার উপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবাগণ ও মুসলিমদের আম জনগণ আছেন, তা হল এই যে, কোন অবস্থায় কোনভাবে আল্লাহর কিতাব ও রাসূলুল্লাহর সুন্নাহর প্রকাশ্য উক্তি থেকে ফিরে আসা বৈধ নয়। হ্যাঁ, তবে যদি কোন সহীহ শরয়ী দলীল থাকে, যা তার স্পষ্ট অর্থ (মুখ্যার্থ বা বাচ্যার্থ) থেকে সম্ভাব্য কোন গৌণ অর্থের

দিকে ফিরিয়ে দেয়। (তাহলে সে কথা ভিন্ন।)' (আযওয়াউল বায়ান ৭/৪৩৮)

৬নং নীতি

সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামার উক্তি দিয়ে দলীলের প্রকাশ্য উক্তির বিরোধিতা করা যাবে না।

সংখ্যাগরিষ্ঠতা কোন দলীল নয়। সুতরাং তা দিয়ে দলীলকে সাংঘর্ষিক করা যাবে না।

হাদীসের বাচ্যার্থ হল, কাজটি ওয়াজেব এবং তার কোন নাকচকারী দলীল নেই। সুতরাং সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামা তা মুস্তাহাব বললেও তা মান্য নয়।

হাদীসের বাচ্যার্থ হল, কাজটি হারাম এবং তার কোন নাকচকারী দলীল নেই। সুতরাং সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামা তা মাকরূহ বললেও তা মান্য নয়।

হাদীসের বাচ্যার্থ হল, কাজটি আম বা ব্যাপক এবং তার কোন নাকচকারী দলীল নেই। সুতরাং সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামা তা খাস বা বিশিষ্ট বললেও তা মান্য নয়।

আল্লামা সিদ্দীক হাসান বলেছেন, 'অধিকাংশ উম্মাহর আমলের বিপরীত হলেও সহীহ হাদীসের কোন ক্ষতি হয় না। যেহেতু সংখ্যাগরিষ্ঠের উক্তি কোন দলীল নয়। (আর সহীহ হাদীসই হল পোক্ত দলীল।)' *(ক্বাওয়ায়িদুত তাহদীষ ৯১পৃঃ)*

৭নং নীতি

কোন সম্ভাব্য অর্থ থাকার কারণে দলীল অকেজো হয়ে যায় না।

এমন হলে বহু দলীল বাতিল বলে পরিগণিত হবে। তবে হ্যাঁ, যদি পার্শ্ব-সংকেতপুষ্ট শক্তিশালী সম্ভাবনা থাকে, তাহলে ভিন্নকথা।

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে শুয়ে থাকতাম এবং আমার পা-দুটি তাঁর ক্বিবলাতে থাকত। যখন তিনি সিজদা করার ইচ্ছা করতেন, তখন আমাকে খোঁচা দিতেন। আর আমি পা গুটিয়ে নিতাম। অতঃপর তিনি দাঁড়িয়ে গেলে আবার বিছিয়ে দিতাম।' (বুখারী ৩৮২, ৫১৩, মুসলিম ১১৭৩নং)

উক্ত হাদীসের বাচ্যার্থ প্রমাণ করে যে, নারী স্পর্শ করলে উযূ ভাঙ্গে না।

কিন্তু অনেকে বলেছেন, 'এ কথার সম্ভাবনা রয়েছে যে, এটা নবী ﷺ-এ বৈশিষ্ট্য অথবা সে স্পর্শ ছিল কোন আবরণের উপরে।

আল্লামা আহমাদ শাকির এর টীকায় লিখেছেন, 'এ কথা সুস্পষ্ট ও পরিষ্কার যে, এই সমালোচনার কোনই মূল্য নেই। বরং তা বাতিল। কারণ নবী ﷺ-এর বিশিষ্টতা স্পষ্ট দলীল ছাড়া প্রমাণিত হয় না। আর আবরণ থাকার সম্ভাবনার কথা পক্ষপাতদুষ্ট ছাড়া অন্য কেউ ভাবতে পারে না।' (তাঁর তিরমিযীর টীকা ১/১৪২)

৮নং নীতি

হাদীস সহীহ হলে সকল নীতি, আকীদা ও আহকামের দলীল হওয়াতে মুতাওয়াতির ও আহাদের মাঝে কোন পার্থক্য নেই।

অর্থাৎ, মুতাওয়াতির যেমন মুতাওয়াতির রহিত করতে পারে, তেমনি আহাদও মুতাওয়াতির রহিত করতে পারে।

মুতাওয়াতির যেমন আমকে খাস করতে পারে, তেমনি আহাদও আমকে খাস করতে পারে।

মুতাওয়াতির যেমন কিয়াসের উপর প্রাধান্য পায়, তেমনি আহাদও কিয়াসের উপর প্রাধান্য পায়।

এই আমলই ছিল সলফদের মাঝে। এ ব্যাপারে বিস্তারিত উদাহরণ-সহ উসূলের বড় বড় কিতাব দ্রষ্টব্য। *(ইরশাদুল ফুহূল, মুযাক্কিরাতুন ফী উসূলিল ফিক্বহ)*

৯নং নীতি

দলীল অনুযায়ী আমল করা জরুরী; যদিও এ কথা অজানা থাকে যে, সেই অনুযায়ী কেউ আমল করেছে কি না।

আল্লামা আলবানী বলেন, 'কোন ফকীহ কোন এক হাদীসের উপর আমল করেছেন কি না, এ কথার অজ্ঞতা হাদীসের কোন ক্ষতি করে না এবং তার উপর আমলে বাধা দিতে পারে না। যেহেতু কোন জিনিসের অপ্রাপ্তি তার অস্তিত্বহীনতার দলীল নয়।' (সিঃ সহীহাহ হাদীস নং ১৬৩)

১০নং নীতি

দলীল অনুযায়ী আমল করা জরুরী; যদিও কোন কোন সলফ তার বিপরীত কথা বলেছেন।

সঙ্গে কুরবানী না থাকলে আবূ বাক্র ﷺ ও উমার ﷺ ইফরাদ হজ্জকে উত্তম মনে করতেন। পক্ষান্তরে সহীহ সুন্নাহতে তামাত্তু হজ্জ উত্তম হওয়ার

ব্যাপারে বর্ণনা আছে। সেই ভিত্তিতে ইবনে আব্বাস ﷺ তামাত্তু হজ্জ উত্তম বলে ফতোয়া দিতেন। কিন্তু কেউ কেউ আবূ বাক্‌র ও উমারের কথা বললে তিনি বলেছিলেন, "অতি সত্বর তোমাদের উপর পাথর বর্ষণ হবে। আমি বলছি, 'আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন।' আর তোমরা বলছ, 'আবূ বাক্‌র ও উমার বলেছেন।" *(আহমাদ ১/৩৩৭, এর সনদটি দুর্বল। অবশ্য উক্ত অর্থেই সহীহ সনদে মুসান্নাফ আব্দুর রায্যাকে একটি আসার বর্ণিত হয়েছে। দেখুন ঃ যাদুল মাআদ ২/১৯৫, ২০৬)*

একই ব্যাপারে আব্দুল্লাহ বিন উমারকে এক ব্যক্তি বলল, 'আপনার আব্বা তো তামাত্তু হজ্জ করতে নিষেধ করেছেন।' এ কথা শুনে তিনি তাকে বললেন, 'আল্লাহর রসূল ﷺ-এর আদেশ অধিক মানার যোগ্য, নাকি আমার আব্বার?' *(যাদুল মাআদ ২/১৯৫)*

ক্বাতাদাহ বলেন, ইবনে সীরীন এক ব্যক্তিকে একটি হাদীস বয়ান করলেন। তা শুনে এক ব্যক্তি বলল, 'কিন্তু অমুক তো এই বলেন।'

প্রত্যুত্তরে ইবনে সীরীন বললেন, 'আমি তোমাকে নবী ﷺ-এর হাদীস বয়ান করছি, আর তুমি বলছ, অমুক ও অমুক এই বলেছে?! আমি তোমার সাথে কোনদিন কথাই বলব না।' *(দারেমী ৪৪১নং)*

১১নং নীতি

লোকেরা বিপরীত আমল করলেও, দলীল বর্জন করা যাবে না।

যে সুন্নাহ অনুযায়ী আমল করবে, সেই হবে হকপন্থী, সেই হবে জামাআত; যদিও সে একা হয়।

১২নং নীতি

সহীহ দলীল কোন সময় সঠিক জ্ঞান ও সুস্থ বিবেকের প্রতিকূল হয় না। এমন মনে হলেও বিনা প্রতিবাদে তাকে দলীল মেনে নিতে হবে।

আলী ﷺ বলেন, 'দ্বীনে যদি রায় ও বিবেকের স্থান থাকত, তাহলে মোজার উপরের অংশ অপেক্ষা নিচের অংশই অধিক মাসাহযোগ্য হত। কিন্তু আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে তাঁর মোজার উপরের অংশে মাসাহ করতে দেখেছি।' *(আহমাদ, আবূ দাউদ ১৬২নং, দারেমী, মিশকাত ৫২৫নং)*

১৩নং নীতি

যে দলীলে আম কথা আছে, তাকে বিনা দলীলে খাস করা যাবে না। আমকে

কোন খাস সময়, স্থান, পদ্ধতি, গুণ বা সংখ্যা ইত্যাদি দ্বারা সীমাবদ্ধ করা যাবে না।

যেমন মাসিকের সময়-সীমা, সফরের সময়-সীমা ইত্যাদি।

১৪নং নীতি

দলীল সহীহ জানার পর দলীলের সঠিক অর্থ বুঝতে হবে এবং তাতে কোন প্রকার অবজ্ঞা বা অতিরঞ্জন করা যাবে না। দলীল প্রয়োগে বাড়াবাড়ি করা যাবে না। মাসআলা ব্যক্ত করাতে ওয়াজেব যেন মুস্তাহাবের এবং মুস্তাহাব যেন ওয়াজেবের মান না পায়।

১৫নং নীতি

দলীলে উল্লিখিত ব্যক্তি বিশেষের কোন ঘটনা থাকলে তার আহকাম সকলের জন্য ব্যাপক হবে। অবশ্য বিশেষত্বের দলীল থাকলে আলাদা কথা।

মহান আল্লাহ বলেন,

{وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاء مَرْضَاتِ اللهِ} (٢٠٧) سورة البقرة

"পক্ষান্তরে এমন লোকও আছে, যে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আত্মবিক্রয় করে দেয়।" (বাক্বারাহ ঃ ২০৭)

এই আয়াত সম্পর্কে বলা হয় যে, সুহায়ব রূমী ﷺ-এর ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। যখন তিনি হিজরত করেন, তখন মক্কার কাফেররা বলল, এই ধন-সম্পদ এখানকারই উপার্জিত বিধায় আমরা তা সাথে করে নিয়ে যেতে দিবো না। সুহায়ব ﷺ সমস্ত ধন-সম্পদ তাদেরকে সমর্পণ ক'রে দ্বীন নিয়ে রাসূল ﷺ-এর নিকটে উপস্থিত হয়ে গেলেন। তিনি তাঁর ঘটনা শুনে বললেন, "সুহায়ব অতীব লাভদায়ক ব্যবসা করেছে।" কথাটি তিনি দু'বার বলেছিলেন। *(ফাতহুল ক্বাদীর)* কিন্তু এ আয়াতও ব্যাপক অর্থের, যা সমস্ত মু'মিন, আল্লাহভীরু এবং দুনিয়ার মোকাবেলায় দ্বীনকে প্রাধান্য দানকারী সকলকেই শামিল করে থাকে। কেননা, কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা বিশেষ ঘটনাকে কেন্দ্র করে অবতীর্ণ হওয়া সমস্ত আয়াতের ব্যাপারে নীতি হল,

العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب.

'বাচ্যার্থের ব্যাপকতাই লক্ষণীয়, অবতীর্ণের কারণবিষয়ক ঘটনার বিশেষত্ব নয়'।

অর্থাৎ, আয়াতের যে অর্থ তার ব্যাপকতাকেই প্রাধান্য দেওয়া হবে, বিশেষ কোন কারণে নাযিল হয়ে থাকলেও অর্থ কেবল তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ হবে না। সুতরাং আখনাস বিন শুরাইক (যার কথা পূর্বের আয়াতে এসেছে) মন্দ চরিত্রের একটি নমুনা। যারাই এই চরিত্রের অধিকারী হবে, তারা সকলেই তার শ্রেণীভুক্ত হবে। অনুরূপ যারা উত্তম গুণাবলী এবং পূর্ণ ঈমানের গুণে গুণান্বিত হবে, তাঁদের সকলের জন্য নমুনা হবেন সুহায়ব ﷺ।

রমযানের রোযা অবস্থায় সহবাসের ঘটনা ও তার কাফ্ফারার বিধান যে সাহাবীকে নিয়ে হয়েছিল, তা কেবল তাঁরই জন্য খাস নয়। বরং সে বিধান সকলের জন্য আম।

অবশ্য কোন বিধানের ক্ষেত্রে যদি পরিষ্কার কারো জন্য খাস হওয়ার কথা উল্লেখ থাকে, তাহলে সে কথা আলাদা। যেমন সাহাবী আবূ বুরদাহ ﷺ-কে ছয় মাসের মেষশাবক কুরবানী করার অনুমতি দিয়ে বলেছিলেন, "তোমার পরে আর কারো জন্য যথেষ্ট (বা বৈধ) নয়।" (বুখারী ৯৫৫নং)

ইজমা'

ইজমা' শরীয়তের অন্যতম দলীল। এর অর্থ হল, সর্ববাদীসম্মতি। তার মানে কোন এক বিষয়ে সকল পক্ষের একমত হওয়া এবং কোন পক্ষের দ্বিমত বা বিরোধিতা না থাকা।

শরীয়তের পরিভাষায় ঃ কোনও বিষয়ে নবী ﷺ-এর ইন্তিকালের পর কোনও যুগে তাঁর উম্মতের সকল মুজতাহিদগণের একমত হওয়া।

এ বিষয়েও রয়েছে নানা নীতিমালা।

১নং নীতি

ইজমা' অন্যতম শরয়ী হুজ্জত (প্রমাণ)।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{ ومَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الهُدَى ويَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ المؤمِنِينَ نُوَلِّهِ ماتَوَلَّى وَنصْلِهِ جَهنَّمَ وسَاءتْ مَصِيرًا } (النساء : ١١٥)

"আর যে ব্যক্তি তার নিকট সৎপথ প্রকাশ হওয়ার পর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করবে এবং বিশ্বাসীদের পথ ভিন্ন অন্য পথ অনুসরণ করবে, তাকে আমি

সেদিকেই ফিরিয়ে দেব, যেদিকে সে ফিরে যেতে চায় এবং জাহান্নামে তাকে দগ্ধ করব। আর তা কত মন্দ আবাস!” (নিসা ঃ ১১৫)

আর মহানবী ﷺ বলেছেন,

((إن أمتي لا تجتمع على ضلالة))

“নিশ্চয় আমার উম্মত কোন ভ্রষ্টতার উপর একমত হবে না।” *(আবূ দাউদ ৪২৫৩, তিরমিযী ২১৬৭, ইবনে মাজাহ ৩৫৯০নং)*

২নং নীতি

ইজমা’র জন্য কিতাব ও সুন্নাহ থেকে কোন সূত্র থাকতে হবে।

অবশ্য সে সূত্র অনেকের জানা না থাকতে পারে। সুতরাং সে ক্ষেত্রে ইজমা’ হবে অতিরিক্ত দলীল।

৩নং নীতি

কিতাব বা সুন্নাহ থেকে কোন বিষয় স্পষ্ট হলে তার উপর ইজমা’ প্রাধান্য পাবে না।

সে ক্ষেত্রে ইজমা’ ফেলে কিতাব ও সুন্নাহর অনুসরণ করতে হবে।

৪নং নীতি

কিতাব ও সুন্নাহর কোন উক্তিকে ইজমা’ রহিত করতে পারে না।

৫নং নীতি

যে বিষয়ে ইজমা’ হয়েছে বলে সুদৃঢ় ধারণা করা হয়, তা হবে দ্বীনের সুস্পষ্ট বিষয়।

যেমন যোহরের নামায ৪ রাকআত। মদ হারাম ইত্যাদি বিষয়। কোন ঢাকা-ছুপা বিষয়ে ইজমা’ হয় না। নচেৎ ইজমা’ হবে আকাশ-কুসুম। সে ক্ষেত্রে সঠিকার্থে ইজমা’ দাবী করা বড় কঠিন। কারণ কেউ কোথাও যে দ্বিমত পোষণ ক’রে বসে নেই, তা বলা খুব মুশকিল। এই জন্য ইমাম আহমাদ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি ইজমা’র দাবী করে, সে মিথ্যুক।’ (শারহু যাদিল মুস্তাক্বনি’ ৯/২১৫)

৬নং নীতি

সাহাবাগণের ইজমা’ সংঘটন সম্ভব। কিন্তু তাঁদের পরবর্তীকালের উলামাগণের মাঝে ইজমা’ প্রায় অসম্ভব। (মাজমূউ ফাতাওয়া ইবনে

তাইমিয়াহ ১১/৩৪১)

৭নং নীতি

ইজমা'র বিষয়ে যদি দুইজন আলেম মতভেদ করেন; একজন দাবী করেন এবং অন্যজন খন্ডন করেন, তাহলে যিনি ইজমা'র খন্ডন করছেন এবং মাসআলায় মতভেদ থাকার কথা বর্ণনা করছেন, তাঁর কথা অগ্রাধিকার পাবে। কারণ তাঁর কাছে অতিরিক্ত ইল্ম আছে। আর যিনি ইজমা'র কথা বলছেন, তাঁর কাছে কোন মতভেদের কথা পৌঁছেনি। (ঐ ১৯/২৭১)

৮নং নীতি

মাসআলায় কোন মতভেদ আছে কি না, সে কথা কারো অজানা থাকলেই তাঁর ইজমা' দাবী করা শুদ্ধ নয়। (ঐ)

৯নং নীতি

কেবল মদীনাবাসীর ইজমা' গ্রহণযোগ্য প্রমাণ নয়। যেহেতু গ্রহণযোগ্য হল উম্মাহর ইজমা'। (ইরশাদুল ফুহূল, শাওকানী ১২৪পৃঃ)

১০নং নীতি

জুমহুর (অধিকাংশ) উলামার ইজমা'ও গ্রহণযোগ্য প্রমাণ নয়। কারণ তাতে একাংশ উলামার মতভেদ বর্তমান থাকে।

কিয়াস

১নং নীতি

কিয়াস শরীয়তের একটি দলীল।

একদা মহানবী ﷺ বললেন, "(সুতরাহ না হলে) সাবালিকা মেয়ে, গাধা ও কালো কুকুর নামায নষ্ট করে ফেলে।" আবূ যার্র বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! হলুদ ও লাল না হয়ে কালো কুকুরেই নামায নষ্ট করে তার কারণ কী?' বললেন, "কারণ, কালো কুকুর শয়তান।" *(মুসলিম ১১৬৫, আবূ দাউদ ৭০২নং প্রমুখ)*

লক্ষণীয় যে, আবূ যার্র ﷺ সাদা ও হলুদ কুকুরকে কালো কুকুরের উপর কিয়াস করেছেন এবং নবী ﷺ তাতে কোন আপত্তি করেননি।

মুদলিজী কিয়াস করেছিলেন। যায়দ ও উসামার পায়ের কিয়াসে রাসূলুল্লাহ ﷺ খোশ হয়েছিলেন। (বুখারী ৩৫৫৫, মুসলিম ৩৬৯১নং)

উমার বিন খাত্ত্বাব আবূ মূসাকে লেখা চিঠিতে কিয়াস করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। (ইসমাঈলী, মুসনাদুল ফারূক ২/৫৪৬)

২নং নীতি

কিতাব-সুন্নাহ থেকে স্পষ্ট নির্দেশ থাকতে কিয়াস অচল। যেহেতু তা হল পানি না পেলে তায়াম্মুম করার মতো। বলা বাহুল্য, পানি থাকলে (ব্যবহার সম্ভব হলে) তায়াম্মুম চলে না।

৩নং নীতি

প্রয়োজন ছাড়া কিয়াস করা যাবে না। যখন কুরআন-সুন্নাহ থেকে কোন স্পষ্ট বিধান অমিল হবে, তখন কিয়াস জায়েয হবে।

এ নীতি আগের নীতিরই অনুরূপ।

৪নং নীতি

যার উপর কিয়াস করা হবে, তা প্রমাণিত হতে হবে।

৫নং নীতি

সঠিক কিয়াস যয়ীফ হাদীসের উপর প্রাধান্য পাবে।

আসলে সহীহ হাদীস থাকতে কিয়াস অচল। আর যয়ীফ হাদীস না থাকার মতো। সুতরাং তখনই কিয়াস বৈধ হবে। আর সে ক্ষেত্রে যয়ীফ হাদীসের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করা যাবে না।

৬নং নীতি

সাহাবীর উক্তি কিয়াসের উপর প্রাধান্য পাবে।

সাহাবীর উক্তি, ফতোয়া বা রায়, যার কোন বিরোধী নেই, তা কিয়াসের উপর প্রাধান্য পাবে। কিয়াস না মেনে সাহাবীর রায়কে মানতে হবে। যেহেতু তাঁদের রায় সবার চাইতে অগ্রগণ্য।

৭নং নীতি

শরীয়তের বিধান তার কার্যকারণের সাথে সম্পৃক্ত।

কোন বিষয়ের কার্যকারণ থাকলে যে বিধান হয়, তা না থাকলে সে বিধান

আরোপিত হয় না।

যেমন মদ হল হারাম। এর কার্যকারণ হল মাদকতা। কিন্তু কোনভাবে তার মাদকতা দূরীভূত করা গেলে তা আর হারাম থাকবে না। সেই জন্য সির্কা হালাল।

ফাসেক ব্যক্তির সাক্ষ্য ও হাদীসের বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু তার ফিস্‌ক দূর হয়ে গেলে তার গ্রহণযোগ্যতা ফিরে আসবে।

অনুরূপভাবে, ব্যভিচারিণীকে বিবাহ করা মু'মিনদের জন্য হারাম। কিন্তু সে বিশুদ্ধ তওবা করলে তাকে বিবাহ করা হালাল হয়ে যাবে।

৮নং নীতি

বিধানের হেতু বা কার্যকারণ দলীল ছাড়া আন্দাজে-অনুমানে প্রমাণিত হবে না। যেমন বিধানের দলীল আবশ্যক, তেমনি কার্যকারণেরও দলীল আবশ্যক। আর দলীল হতে হবে কিতাব, সুন্নাহ ও ইজমা' হতে।

কিতাব-সুন্নাহর স্পষ্ট উক্তি হতে হবে, তা না হলে বাক্যের উদ্দেশ্য বা ভাবধারা।

স্পষ্ট উক্তিতে কারণ বর্ণনা, যেমন স্বা'ব বিন জাষ্‌ষামাহ ﷺ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে (শিকার করা) এক জংলী গাধা উপঢৌকন দিলাম। কিন্তু তিনি তা আমাকে ফিরিয়ে দিলেন। তারপর তিনি আমার চেহারায় (বিষণ্নতার চিহ্ন) দেখে বললেন,

((إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلاَّ لأَنَّا حُرُمٌ)).

"আমরা ইহরামের অবস্থায় আছি, তাই আমরা এটি তোমাকে ফিরিয়ে দিলাম।" *(বুখারী ১৮২৫, মুসলিম ২৯০২নং)*

উক্ত হাদীসে শিকার করা পশুর গোশ্‌ত মুহরিমের জন্য হালাল নয়, তার কারণ স্পষ্ট শব্দে বিবৃত হয়েছে। যেমন সে নিজে শিকার করতে পারে না, তেমনি শিকারকৃত পশুর মাংসও খেতে পারে না।

তালাকপ্রাপ্তা গর্ভবতী হলে, প্রসব অবধি তার ভরণ-পোষণ ওয়াজেব। সে বিষয়ে শর্তারোপ ক'রে মহান আল্লাহ বলেছেন,

{ وَإِنْ كُنَّ أُولاَتِ حملٍ فأَنْفِقُوا عليهِنَّ حَتَّى يَضعْنَ حَمْلَهُنَّ } [الطلاق : ٦]

"তারা গর্ভবতী থাকলে সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত তাদের জন্য ব্যয় কর।" (ত্বালাক্ব ঃ ৬)

শর্তারোপ না করেও কারণ-সহ বিধান দেওয়া হয়েছে চোরের। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{ والسَّارِقُ والسَّارِقَةُ فاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما } [المائدة : ٣٨]

"চোর এবং চোরনীর হাত কেটে ফেলো।" (মায়িদাহ ঃ ৩৮)

বুঝা গেল, হাত কাটা যাবে চুরি প্রমাণিত হলে।

পক্ষান্তরে উক্তির উদ্দেশ্য বা ভাবধারা থেকে বিধান প্রমাণিত হয়, এর উদাহরণ, 'মা-বাপকে মারধর করো না।'

মহান আল্লাহ সতর্ক ক'রে বলেছেন,

{ فَلا تَقُل لَهُمَا أُفٍّ } [الإسراء : ٢٣]

"(পিতামাতাকে বিরক্তিসূচক) 'উঃ' বলো না---" (বানী ইস্রাঈল ঃ ২৩)

উক্ত আয়াতের শব্দার্থ লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়, যেখানে 'উঃ' বলা যাবে না, সেখানে মারধর তো করাই যাবে না। কারণ সেটা আরো খারাপ।

৯নং নীতি

মাসআলা একই ধরনের মনে হলেও তার কার্যকারণ ভিন্ন হতে পারে।

সে ক্ষেত্রে সতর্কতার সাথে বিধান গ্রহণ করতে হবে।

১০নং নীতি

ইবাদতে কিয়াস চলে না।

যেহেতু ইবাদতের ভিত্তি হল কিতাব ও সুন্নাহ। তাতে অনুমিতির চাকা অচল। যেটা যেভাবে এসেছে, সেটা ঠিক সেইভাবেই পালন করতে হবে। কোন পৃথক ইবাদত প্রমাণ করার জন্য অনুরূপ অন্য কোন ইবাদতের উপর কিয়াস করা যাবে না।

হাদীসে এসেছে,

((إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ ؛ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْراً ، ثُمَّ سَلُوا اللهَ لِيَ الوَسِيلَةَ ؛ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الجَنَّةِ لاَ تَنْبَغِي إِلاَّ لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ ، فَمَنْ سَأَلَ لِيَ الوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ)).

"তোমরা যখন আযান শুনবে, তখন (আযানের উত্তরে) মুআয্যিন যা কিছু

বলবে, তোমরাও ঠিক তাই বলবে। তারপর আযান শেষে আমার উপর দরূদ পাঠ করবে। কেননা, যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করবে, তার বিনিময়ে তার প্রতি আল্লাহ দশটি রহমত নাযেল করবেন। অতঃপর তোমরা আল্লাহর নিকট আমার জন্য 'অসীলা' প্রার্থনা করবে। কারণ, 'অসীলা' হচ্ছে জান্নাতের এমন একটি স্থান, যা সমস্ত বান্দার মধ্যে কেবল আল্লাহর একটি বান্দা (তার উপযুক্ত) হবে। আর আশা করি, আমিই সেই বান্দা হব। সুতরাং যে ব্যক্তি আমার জন্য অসীলা প্রার্থনা করবে, তার জন্য (আমার) সুপারিশ অনিবার্য হয়ে যাবে।" *(মুসলিম ৮৭৫নং)*

উক্ত নির্দেশে মুআয্যিন কি শামিল?

যাঁরা শ্রোতার উপর মুআয্যিনকে কিয়াস করেন, তাঁরা বলেন, 'হ্যাঁ, শামিল।' অতএব মুআয্যিনও আযানের জবাব দেবে এবং দরূদ-দুআ পড়বে।

অনেকে বলেছেন, আযানের জবাব দেবে না, তবে পরের দরূদ ও দুআ পড়বে। যেহেতু সে তা বলে না।

আর যাঁরা 'ইবাদতে কিয়াস চলবে না বিধায় মুআয্যিনকে শ্রোতার উপর কিয়াস করা যাবে না' বলেন, তাঁদের নিকট মুআয্যিন নিজের আযানের জবাবও দেবে না এবং পরের দরূদ ও দুআও পড়বে না।

খাওয়ার শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' বলতে ভুলে গেলে এবং মাঝে মনে পড়লে বলতে হয়, 'বিসমিল্লাহি আওয়ালাহু ওয়া আ-খিরাহ।' অনুরূপ তার উপর কিয়াস ক'রে উযুর শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' বলতে ভুলে গেলে এবং মাঝে মনে পড়লে 'বিসমিল্লাহি আওয়ালাহু ওয়া আ-খিরাহ' বলা বিধেয় নয়।

হজ্জ-উমরাহ বা সদকাহ দ্বারা ঈসালে সওয়াব করা বিধেয় হলেও তার উপর অনুমান ক'রে কুরআনখানি ক'রে ঈসালে সওয়াব বৈধ নয়। যেহেতু এ কাজের পৃথক কোন দলীল নেই।

অনুরূপ যোহরের উপর জুমআহকে কিয়াস ক'রে জুমআহ-আসর জমা করা যাবে না।

রসূল ﷺ-এর কর্মাবলী

মহানবী ﷺ তাঁর জীবনে দুনিয়া ও আখেরাতের বহু কর্মই করেছেন। সেই সকল কর্ম আমাদের জন্য কখন করণীয় ও কখন নয়, তার জন্য নিম্নোক্ত

নীতিমালা জানা আবশ্যক।

১নং নীতি

দলীল ছাড়া তাঁর বিশেষত্ব প্রমাণিত হবে না।

তিনি যে কাজটি করেছেন, তা কি তাঁর বিশেষত্ব? তার মানে তাঁর উম্মতের করণীয় নয়? এর জন্য দলীল চাই। নচেৎ তাঁর প্রতিটি কর্ম উম্মতের জন্য পালনীয় সুন্নাহ হবে। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেছেন,

{ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ } (الأحزاب : ٢١)

"তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহর (চরিত্রের) মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে।" (আহ্যাব ঃ ২১)

অতএব কোন স্পষ্ট দলীল দ্বারা যখন প্রমাণিত হবে যে, সে কাজ তাঁর জন্য খাস (বিশেষ) ছিল, তাহলে তা আমাদের করণীয় নয়।

২নং নীতি

যে ইবাদত তিনি নিরবচ্ছিন্নভাবে করেননি, তা আমাদের জন্য নিরবচ্ছিন্নভাবে (বাদ না দিয়ে) ক'রে যাওয়া বিধেয় নয়।

যেহেতু ইবাদতের মৌলিক নীতি হল, তা নিষেধ; যতক্ষণ না তা দলীল দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং যে ইবাদত নবী ﷺ একটানা করেননি, তা আমরা করতে পারি না। যেমন জামাআতবদ্ধভাবে নফল নামায পড়া।

আনাস ﷺ বলেন, একদা তাঁর নানী খানা বানিয়ে নবী ﷺ-কে বাড়িতে দাওয়াত দিয়েছিলেন। তিনি তা খেয়ে বললেন,

((قُومُوا فَلِأُصَلِّ لَكُمْ))

"ওঠো, তোমাদের জন্য নামায পড়ি।"

সুতরাং আনাস, একজন এতীম এবং নানীকে নিয়ে তিনি জামাআত সহকারে ২ রাকআত নফল পড়েছিলেন। (বুখারী ৩৮০, মুসলিম ১৫৩১নং)

সুতরাং কখনো কখনো কোন প্রয়োজনে তা করা যায়। যেমন নামায শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজনে আমরা তা করতে পারি। সর্বদা নয়।

৩নং নীতি

তাঁর মৌনসম্মতি বা স্বীকৃতি একটা দলীল।

তাঁর সম্মুখে কোন কাজ করা হয়েছে এবং তাতে তিনি বাধা দেননি, তাঁর এই

বাধাদান না করাটা সম্মতি বা স্বীকৃতির দলীল। যেহেতু যথাসময়ে বিধান স্পষ্ট না করা শরীয়তের নীতি নয়। সাহাবাগণ তাঁর স্বীকৃতিকে প্রমাণ মনে করতেন। (বুখারী ৭৩৫৫নং)

৪নং নীতি

যে কাজ নবী ﷺ-এর যুগে ঘটেছে, সে কাজও দলীল হিসাবে স্বীকৃত; যদিও সে কাজের ব্যাপারে তাঁর অবগতি ছিল না। যেমন জাবের বিন আব্দুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আমরা 'আয্‌ল' (সঙ্গমের সময় স্ত্রী-যোনির বাইরে বীর্যপাত) করতাম। যে যুগে কুরআন অবতীর্ণ হতো।" (বুখারী ৫২০৯নং)

অর্থাৎ, সে সময় ছিল বিধান অবতীর্ণ হওয়ার সময়। তখন আমরা এ কাজ করেছি। তা যদি হারাম হতো, তাহলে আমাদেরকে নিষেধ করা হতো।

যেমন আব্দুল্লাহ বিন উমার বলেছেন, 'আমরা নবী ﷺ-এর যুগে আমাদের স্ত্রীদের সাথে (অতিরিক্ত) কথা বলা ও হাসি-রহস্য করা হতে দূরে থাকতাম এই ভয়ে যে, আমাদের ব্যাপারে কিছু অবতীর্ণ হয়ে যায় (যাতে তা নিষিদ্ধ করা হয়)। অতঃপর তিনি যখন ইন্তিকাল করলেন, তখন আমরা কথা বলতে ও হাসি-রহস্য করতে লাগলাম।' (বুখারী ৫১৮৭নং)

৫নং নীতি

মহানবী ﷺ-এর কর্ম উম্মতের জন্য ওয়াজেব নয়। অবশ্য কোন ওয়াজেবের ব্যাখ্যা স্বরূপ হলে তা আলাদা কথা। তিনি আমাদের আদর্শ ও অনুসরণীয়, কিন্তু তাঁর সকল কর্মই আমাদের জন্য পালন করা আবশ্যক, তা নয়। বরং যা সুন্নাহ, তা পালন করলে আমরা সওয়াবের অধিকারী হব। পক্ষান্তরে ওয়াজেব পালন না করলে গোনাহগার হব।

৬নং নীতি

যে জিনিস আসলে মুবাহ, কিন্তু নবী ﷺ বর্জন করেছেন, তা বর্জন করা আমাদের জন্য ওয়াজেব নয়।

তিনি বলেছেন,

((ذَرُوْنِي مَا تَرَكْتُكُمْ ؛ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ ، وَاخْتِلاَفِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ ، فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَن شَيْءٍ فَدَعُوهُ)).

"তোমরা আমাকে (আমার অবস্থায়) ছেড়ে দাও, যতক্ষণ আমি তোমাদেরকে

(তোমাদের স্ব স্ব অবস্থায়) ছেড়ে রাখব। কেননা, তোমাদের পূর্বেকার জাতিরা অতি মাত্রায় জিজ্ঞাসাবাদ ও তাদের পয়গম্বরদের বিরোধিতা করার দরুন ধ্বংস হয়েছে। সুতরাং আমি যখন তোমাদেরকে কোন কিছু করার আদেশ দেব, তখন তোমরা তা সাধ্যমত পালন করবে। আর যা করতে নিষেধ করব, তা থেকে বিরত থাকবে।" *(মুসলিম ৩৩২১, বুখারী ৭২৮৮নং)*

সুতরাং এখানে স্পষ্ট যে, তাঁর আদেশ ও নিষেধ পালন করাই ওয়াজেব। তিনি যা ত্যাগ করেছেন, তা ত্যাগ করা নয়।

'যব্ব' (সান্ডা) খাওয়া ত্যাগ করার ব্যাপারেও সেই নীতিই স্পষ্ট হয়েছে।

৭নং নীতি

যে কাজ নবী ﷺ করার ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন, কিন্তু করেননি, তা আমাদেরকে করতে হবে, এমন নয়। যদি না তার সাথে সহযোগী অন্য কোন দলীল থাকে।

তিনি জামাআততত্যাগীদের ব্যাপারে বলেছিলেন,

((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْتَطَبَ ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلاَةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيَؤُمَّ النَّاسَ ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ)).

"সেই মহান সত্তার শপথ! যাঁর হাতে আমার জীবন আছে। আমার ইচ্ছা হচ্ছে যে, জ্বালানী কাঠ জমা করার আদেশ দিই। তারপর নামাযের জন্য আযান দেওয়ার আদেশ দিই। তারপর কোন লোককে লোকেদের ইমামতি করতে আদেশ দিই। তারপর আমি স্বয়ং সেই সব (পুরুষ) লোকদের কাছে যাই (যারা মসজিদে নামায পড়তে আসেনি) এবং তাদেরকে-সহ তাদের ঘর-বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিই।" *(বুখারী ৬৪৪, ৭২২৪, মুসলিম ১৫১৩নং)*

তাঁর এই ইচ্ছা পূরণ করা আমাদের কর্তব্য নয়।

৮নং নীতি

তাঁর নিছক প্রকৃতিগত কাজ আমাদের জন্য অনুসরণীয় এমন কাজ নয়, যার দ্বারা মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যায়।

যেমন সফরে সেই পথ চলা, যেটা দিয়ে তিনি চলেছেন। সেখানে অবতরণ ক'রে বিশ্রাম নেওয়া, যেখানে তিনি অবতরণ ক'রে বিশ্রাম নিয়েছেন। সেখানে প্রস্রাব করা, যেখানে তিনি প্রস্রাব করেছেন। সেখানে উযূ করা, যেখানে তিনি উযূ

করেছেন। ইত্যাদি আমাদের জন্য পালনীয় নয়। ইবনে উমার ﵁ করলেও অন্যান্য বড় বড় সাহাবী ﵃গণ তা করেননি। তা মুস্তাহাব হলে অবশ্যই তাঁরা করতেন।

আমরা তাঁর 'আদাত' (প্রকৃতিগত অভ্যাস)কে ইবাদাত মনে করতে পারি না। তিনি যেটা ইবাদত হিসাবে করেছেন, তার অনুকরণ অবশ্যই করতে হবে। যেভাবে যে জায়গায় করেছেন, তা ইবাদত মনে করে আমাদেরকে করতে হবে। যেমন কা'বা-গৃহের তাওয়াফ, হাজারে-আসওয়াদের চুম্বন, মাকামে ইব্রাহীমের পশ্চাতে নামায, মিনা-আরাফাত-মুযদালিফা গমন ইত্যাদি আরো অনেক কর্ম।

পক্ষান্তরে যে সকল কাজ তিনি ইবাদত হিসাবে করেননি, তা উম্মতের জন্য পালনীয় কর্তব্য নয়। যেমন হজ্জে আবত্বাহ বা মুহাস্‌স্বাব নামক স্থানে অবস্থান করা সুন্নত নয়। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেছেন, 'মিনা হতে বের হওয়া সহজ ও সুবিধা হবে, তাই তিনি সেখানে অবস্থান করেছিলেন।' *(আহমাদ ২৪১৪৩, মুসলিম ৩২২৯, তিরমিযী ৯২২, ইবনে মাজাহ ৩০৬৭নং)*

ঘটনাক্রমে নবী ﷺ যে কাজগুলি করেছেন, তা করতে নিষেধ করেছেন দ্বিতীয় খলীফা উমার বিন খাত্ত্বাব ﵁। সুতরাং তিনি এক হজ্জ সফরে ফজরের নামায পড়ে দেখলেন লোকেরা এক স্থানে এসে নামায পড়ছে এবং বলাবলি করছে, 'এখানে নবী ﷺ নামায পড়েছেন।' তা দেখে ও শুনে তিনি বললেন, 'আহলে কিতাব ধ্বংস হয়েছে এই কারণে যে, তারা তাদের নবীদের স্মৃতিস্থান অনুসরণ ক'রে গির্জা ও উপাসনালয় বানিয়ে নিয়েছে। সুতরাং তোমাদের সেই স্থানে নামাযের সময় হলে নামায পড়ো, নচেৎ অতিক্রম ক'রে চলো। *(মুস্বান্নাফ আব্দুর রাযযাক ২৭৩৪, মুস্বান্নাফ ইবনে আবী শাইবাহ ৭৬৩২নং, স্বিরাতে মুস্তক্বীম ইবনে তাইমিয়্যাহ ২/৭৪৪)*

বলা বাহুল্য, মক্কা থেকে মদীনা যেতে নবী ﷺ-এর হিজরতের দূরবর্তী পথ অবলম্বন করা। গারে হিরা বা গারে সওরে গিয়ে নামায পড়া। তিনি যেমন কাপড়-জুতা ব্যবহার করেছেন, তেমন কাপড়-জুতা ব্যবহার করা। ইত্যাদি প্রকৃতিগতভাবে এখতিয়ারকৃত আচরণ উম্মতের জন্য অনুসরণীয় নয়।

৯নং নীতি

পার্থিব যে জিনিসকে নবী ﷺ ভালোবেসেছেন, সেই জিনিসকে ভালোবাসা মুস্তাহাব।

যেমন আনাস ﷺ লাউ খেতে ভালোবাসতেন। যেহেতু তিনি দেখেছিলেন, নবী ﷺ তা পছন্দ করেছেন। (বুখারী ২০৯২, মুসলিম ৫৪৪৬নং)

১০নং নীতি

এমন প্রকৃতিগত কাজ, যে কাজ তিনি নিরবচ্ছিন্নভাবে করেছেন, সম্ভবতঃ সে কাজ শরীয়ত। অতএব তাঁর সে কাজকে সুন্নত মনে ক'রে পালন করা যাবে। যেহেতু আমভাবে তিনি আমাদের আদর্শ। যেমন ফজরের সুন্নত পড়ার পর বাড়িতে একটু শয়ন করা।

১১নং নীতি

যে কাজের প্রয়োজনীয়তা বর্তমান এবং তাতে কোন বাধা অবর্তমান, সে কাজ তিনি বর্জন করলে, তা বর্জন করাই সুন্নত এবং তা সম্পাদন করা বিদআত। এটাকে 'সুন্নাতে তারকিয়্যাহ' বলা হয়।

কিন্তু শর্ত হল, সে কাজের প্রয়োজন থাকা। যেমন ঈদের নামাযের জন্য আযান। প্রয়োজন বর্তমান, আর তা হল লোকেদেরকে সমবেত করা। কিন্তু তা সত্ত্বেও নবী ﷺ বর্জন করেছেন, সুতরাং তা বর্জন করাই সুন্নত এবং সম্পাদন করা বিদআত।

পক্ষান্তরে প্রয়োজন বর্তমান না থাকার ফলে তিনি যে কাজ করেননি, তা পরবর্তীতে প্রয়োজনের তাকীদে করা বিদআত নয়। যেমন কুরআন জমা করার কাজ তিনি করেননি, পরবর্তীতে সাহাবীগণ করেছেন।

তদনুরূপ কাজের প্রয়োজন বর্তমান ছিল, কিন্তু তাতে কোন বাধা ছিল, যার ফলে তিনি করেননি। সুতরাং তা বর্জন করা আমাদের জন্য সুন্নত নয় অথবা তা সম্পাদন করা আমাদের জন্য বিদআত নয়। যেমন তারাবীহর নামাযে জামাআত। তাঁর জন্য বাধা ছিল, তা ফরয হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা। কিন্তু সে বাধা ছিল না বলেই উমার ﷺ সেটা সম্পাদন করেছিলেন।

১২নং নীতি

নবী ﷺ-এর প্রমাণিত পরস্পরবিরোধী দুই বা ততোধিক কাজের মাঝে পরস্পরবিরোধিতা নেই।

যেহেতু সে ক্ষেত্রে তাঁর কাজের বিভিন্নতা ছিল। সুতরাং সবটাই শরীয়ত।

যেমন পাঁচ ওয়াক্তের নামাযের পদ্ধতি থেকে ভয়ের নামায, চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণের

নামায, সফরের নামায, জানাযার নামায ভিন্ন ভিন্ন। এর সবগুলিই প্রমাণিত, সবগুলিই শরীয়ত।

বৃষ্টি প্রার্থনার জন্য ময়দানে নামায ও দুআ, কেবল দুআ, মসজিদে জুমআর খুতবায় দুআ, সবই প্রমাণিত, সবই শরীয়ত।

তিনি প্রথম রাত্রে তাহাজ্জুদ পড়েছেন, মধ্য রাতে পড়েছেন, শেষ রাতেও পড়েছেন। সবই সুন্নত।

১৩নং নীতি

কখনো যদি তাঁর নির্দেশ ও কর্মের মাঝে পরস্পরবিরোধিতা পরিলক্ষিত হয় এবং উভয়ের মাঝে কোনভাবে সামঞ্জস্য সাধন করা সম্ভব না হয়, তাহলে তাঁর নির্দেশকে তাঁর কর্মের উপর প্রাধান্য দিতে হবে। আর কর্মকে তাঁর বৈশিষ্ট্য মনে করতে হবে। অথবা জানতে হবে সেটা জায়েয বর্ণনার জন্য করেছেন।

যেমন দাঁড়িয়ে পান ও প্রস্রাব করার ক্ষেত্রে উলামাগণ বলেছেন।

১৪নং নীতি

তাঁর যে কর্ম ১৮ (করতেন) বলে বর্ণিত হয়েছে, মূলতঃ তা বারবার করার কথা বোঝায়।

তবে যদি সহযোগী কোন অবলম্বন দিয়ে বুঝা যায় যে, তা বারবার করার জন্য বলা হয়নি, বরং কেবল অতীত বুঝানোর জন্য বলা হয়েছে। যেমন 'যখন তিনি গোসল করতেন, যখন তিনি উযূ করতেন, যখন তিনি নামায পড়তেন, যখন তিনি সফরে যেতেন' ইত্যাদি কর্মে বারবার করার কথা স্পষ্ট। আর এটাই ১৮ (করতেন) শব্দের মৌলিক অর্থ।

সাহাবীর উক্তি

১নং নীতি

সাহাবীর উক্তি এক প্রকার দলীল।

সাহাবীর উক্তি শরীয়তের এক প্রকার দলীল। তবে শর্ত হল ঃ-

তা সহীহ প্রমাণিত হতে হবে; যদিও তা প্রসিদ্ধ না হয়।

কুরআন-হাদীসের উক্তির বিরোধী হবে না।

অন্য কোন সাহাবী তাঁর বিপরীত বলবেন না।

জী! কুরআন ও সুন্নাহর মতো স্বতন্ত্র দলীল নয়। যেমন ইজমা-কিয়াসও তাই।

যেহেতু সাহাবী সর্বশ্রেষ্ঠ শতাব্দীর মানুষ, তিনি ওয়াহী অবতীর্ণ হওয়ার পরিবেশে বাস করেছেন। কাছে থেকে তা শ্রবণ ও উপলব্ধি করেছেন।

তাছাড়া মহানবী ﷺ খুলাফায়ে রাশেদীনের অনুসরণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

তিনি ইবনে আব্বাসকে কুরআনের ব্যাখ্যা ও দ্বীনের ফিক্হ লাভের দুআ দিয়েছেন।

আরো অনেক কারণে তাঁদের উক্তি শরীয়তের এক প্রকার দলীল।

সাহাবী কি ভুলের ঊর্ধ্বে? না, তা নয়। আর তাঁর ভুল প্রমাণিত হলে, তার বিধান আলাদা।

২নং নীতি

সাহাবীর উক্তি প্রসিদ্ধ ও খ্যাত হলে এবং তাঁর কোন বিরোধী না পাওয়া গেলে তা ইজমা বলে গণ্য হবে।

৩নং নীতি

সাহাবীদের উক্তি পরস্পরবিরোধী হলে কিতাব ও সুন্নাহর দিকে রুজু করতে হবে এবং যাঁর কথা কিতাব ও সুন্নাহর বিধানের কাছাকাছি হবে, তাঁর কথা মান্য হবে।

৪নং নীতি

কোন সাহাবীর উক্তি খুলাফায়ে রাশেদীনের মধ্যে কারো উক্তির সাথে সাংঘর্ষিক হলে, খলীফার উক্তি প্রাধান্য পাবে।

৫নং নীতি

হাদীসের বর্ণনাকারী সাহাবী তার অর্থ ও ব্যাখ্যা অন্য সাহাবী থেকে বেশি বোঝেন।

তাই সে ব্যাপারে তাঁরই ব্যাখ্যা প্রাধান্য পাবে।

৬নং নীতি

হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবী যদি বর্ণিত হাদীসের পরিপন্থী মত পোষণ করেন, তাহলে দলীল হবে তাঁর বর্ণিত হাদীস, তাঁর পোষণকৃত মত নয়। আর তাঁর বিপরীত মত পোষণের কোন সম্ভাব্য কারণ খুঁজতে হবে।

নাসেখ-মনসূখ

পূর্বের বিধান বাতিল ক'রে নতুন বিধান বহাল করাকে 'নস্খ' (রহিত করা) বলা হয়। আর পূর্বের বিধানকে 'মনসূখ' (রহিত) এবং পরের বিধানকে 'নাসেখ' (রহিতকারী) বলা হয়।

অবশ্য কোন ব্যাপক বিধানকে নির্দিষ্ট করা এবং অস্পষ্ট বিধানকে স্পষ্ট করাকেও 'নস্খ' বলা হয়ে থাকে। (আল-মুওয়াফাক্বাত, শাত্বেবী ৩/ ১০৮)

১নং নীতি

প্রামাণ্য দলীল দ্বারা নস্খ সাব্যস্ত হবে; কোন সম্ভাবনাময় উক্তি দ্বারা নয়।

দুটি দলীল পরস্পরবিরোধী হলে হতে পারে একটি নাসেখ ও অপরটি মানসূখ। কিন্তু 'হতে পারে' এই সম্ভাবনা দিয়ে 'নস্খ' সাব্যস্ত হবে না।

বলা বাহুল্য, কোন দলীল কোন ইমামের উক্তি বা রায়ের বিরোধী হলে তা মানসূখ ধারণা করা নিঃসন্দেহে অযৌক্তিক।

২নং নীতি

নস্খ কেবল শরীয়তের আহকামের গৌণ বিষয়সমূহে হয়ে থাকে; মূখ্য বিষয়ে নয়। নস্খ কোন ঘটনসূচক বা ঐতিহাসিক বিষয় অথবা তওহীদ ও সিফাত সংক্রান্ত বিষয়ে নস্খ হয় না।

সুতরাং নামায-রোযা প্রভৃতি আহকামে নস্খ এসেছে। তওহীদ বিষয়ে নস্খ আসেনি। যেমন পূর্ববর্তী জাতির ইতিহাস অথবা ভবিষ্যতের ঘটিতব্য কোন ঘটনা, যেমন মাহদী, ঈসা বা দাজ্জালের আগমন অথবা পশ্চিম দিক হতে সূর্যোদয় হওয়া ইত্যাদি বিষয়ে নস্খ আসেনি।

৩নং নীতি

কিয়াস দ্বারা নস্খ সাব্যস্ত হয় না।

মূল হল কিতাব ও সুন্নাহ। কিয়াস হল তার শাখা। সুতরাং শাখা দিয়ে মূলকে রহিত করা যায় না।

৪নং নীতি

সাহাবীর উক্তি নস্খের ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য।

অর্থাৎ, কোন সাহাবী যদি বলেন, 'এই বিধানটি রহিত', তাহলে তা গ্রহণযোগ্য। যেমন আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেছেন, 'বিদিত ১০ বার দুধ পানের ফলে হারাম হওয়ার কথা কুরআনে ছিল। অতঃপর তা বিদিত ৫ বার দুধ পান দ্বারা রহিত করা হয়েছে।' (মুসলিম ৩৬৭০নং)

৫নং নীতি

বর্ণনাকারী সাহাবী পরবর্তীতে ইসলামে দীক্ষিত হয়েছেন, এ কথা নস্‌খ প্রমাণের জন্য দলীল নয়।

সুতরাং যিনি পূর্বে মুসলিম হয়েছেন তাঁর হাদীসকে, যিনি পরে মুসলিম হয়েছেন, তাঁর হাদীস মানসূখ করতে পারে না।

যেহেতু কেবল 'হতে পারে' এমন সম্ভাবনাময় ধারণা দিয়ে পাকা দলীল ছাড়া কোন বিধানকে বাতিল করা যায় না।

পরস্পরবিরোধী দলীলের মাঝে সমন্বয় সাধনের নীতিমালা

১নং নীতি

কার্যত কিতাব ও সুন্নাহর দলীলসমূহের মাঝে কোন স্ববিরোধিতা নেই। যেটা দেখা যায়, সেটা বাহ্যিক। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেছেন,

{ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافًا كَثِيرًا } [النساء : ٨٢]

"এ (কুরআন) যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো তরফ থেকে (অবতীর্ণ) হত, তাহলে নিশ্চয় তারা তাতে অনেক পরস্পর-বিরোধী কথা পেত।" *(নিসাঃ ৮২)*

পক্ষান্তরে যদি দুটি দলীলের মাঝে পরস্পরবিরোধিতা স্পষ্ট হয়, তাহলে তা দূরীকরণের জন্য উভয়ের মাঝে সমন্বয় সাধন করতে হবে অথবা দুটির মধ্যে একটিকে প্রাধান্য দিতে হবে। আর বলা যাবে না যে,

(إذا تعارضا تساقطا)

'দুটি পরস্পরবিরোধী হলে (দলীলের যোগ্যতা থেকে) খসে পড়ে।'

কারণ দলীল কখনই খসে পড়ে না, বেকার বা অকেজো হয় না। বরং তা সমন্বয় সাধন বা প্রাধান্য দেওয়ার নীতির সাথে প্রযোজ্য থাকে। কেউ বুঝতে না

পারলে সেটা তার অক্ষমতা। তার উচিত তফসীর ও হাদীসের ব্যাখ্যাগ্রন্থ এবং অনুরূপভাবে উলামাদের লেখা উক্ত বিষয় বই-পুস্তক পাঠ করা।

২নং নীতি

দুটি দলীলের মাঝে সমন্বয় সাধন করার প্রয়োজনীয়তা পড়বে না, যখন উভয়ের একটি সহীহ (প্রামাণ্য) হবে না।

যয়ীফ বা জাল হাদীস সহীহ হাদীসের বিরোধিতার যোগ্য হতে পারে না। আর সে ক্ষেত্রে পরস্পরবিরোধিতার কোন অভিযোগই থাকে না। বলা বাহুল্য, সহীহ হাদীসের উপর আমলই শিরোধার্য।

৩নং নীতি

দুটি দলীলের মাঝে সমন্বয় সাধনে এমন ব্যাখ্যা করা যাবে না, যা আসলে অপব্যাখ্যা বা দূরতম ব্যাখ্যা। যাতে থাকে কষ্টকল্পনা ও বিবেকবহির্ভূত অনুমান। যেমন কোন একটাকে প্রাধান্য দেওয়ার ক্ষেত্রে তার কিয়াসের অনুকূল থাকাটা গ্রহণযোগ্য বিষয় নয়।

৪নং নীতি

সমন্বয় সাধন অসম্ভব না হলে প্রাধান্য দেওয়ার পর্যায়ে যাওয়া যাবে না।

যেহেতু সমন্বয় সাধিত হলে দুটি দলীলের উপর আমল করা হয়। প্রাধান্য দেওয়া হলে একটি দলীলকে উপেক্ষা করা হয়। সুতরাং যথাসাধ্য সকল দলীলের উপর আমল জরুরী। তাই প্রাধান্য দেওয়ার চাইতে সমন্বয় সাধন নিঃসন্দেহে শিরোধার্য।

সমন্বয় সাধনের বিভিন্ন প্রক্রিয়া রয়েছে। তার মধ্যে কিছু হল ঃ-

নির্দেশকে মুস্তাহাব ধরে নেওয়া।

জায়েয বর্ণনার জন্য ধরে নেওয়া।

ঘটনা একাধিকবার ঘটেছে ধরে নেওয়া।

শব্দকে মূল অর্থে ব্যবহার না ক'রে গৌণ অর্থে ব্যবহার করা। যেমন و কে ثم এর অর্থে ধরে নেওয়া, যাতে পর্যায়ক্রমের অর্থ পাওয়া যায়।

একটির শব্দকে শাব্দিক এবং অন্যটি পারিভাষিক অর্থ করা।

উভয়ের একটির সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যাখ্যা করা।

আর প্রাধান্য দেওয়ার ক্ষেত্রে কিছু প্রক্রিয়া হল ঃ-

অপেক্ষাকৃত কম শক্তিশালী হাদীসের উপর অধিক শক্তিশালী হাদীসকে প্রাধান্য দেওয়া।

ঘটনসূচক বর্ণনাকে নাকচকারী বর্ণনার উপর প্রাধান্য দেওয়া। যেহেতু যিনি ঘটতে দেখেছেন, তাঁর ইল্‌ম অধিক গ্রহণযোগ্য।

বিরোধী বর্ণনাকারীর কাছে দলীল পৌঁছেনি ধরে নেওয়া।

যে দলীলের উপর আমল পূর্বসাবধানতামূলক উত্তম, তাকে প্রাধান্য দেওয়া। ইত্যাদি।

শরয়ী শব্দার্থ বুঝা অপরিহার্য

কুরআন ও সুন্নাহর শব্দ ও বাক্যের সঠিক উদ্দেশ্য বুঝতে হবে তালেবে ইল্‌মকে। সুতরাং এ মর্মে নীতি স্মরণে রাখতে হবে।

১নং নীতি

কিতাব ও সুন্নাহর শব্দাবলীকে শরয়ী প্রকৃতার্থে অনুধাবন করতে হবে।

যেহেতু একই শব্দের আভিধানিক অর্থ থাকে। যেমন তার পারিভাষিক ও রূপক অর্থ থাকে। কিন্তু প্রাথমিকভাবেই শব্দকে শরয়ী পরিভাষায় তার প্রকৃতার্থে অনুধাবন করতে হবে।

যেমন 'উযূ' শব্দের আভিধানিক অর্থ হল, দুই হাত ধোয়া। কিন্তু শরয়ী পরিভাষায় তার অর্থ হল যথানিয়মে নির্দিষ্ট অঙ্গরাজি প্রক্ষালন ও স্পর্শ ক'রে উযূ করা। অতএব উযূর আসল অর্থ হবে শরয়ী পরিভাষার উযূ।

বলা বাহুল্য, কুরআন-হাদীসের পরিভাষাকে ভাষাবিদ বা অন্য কোন নীতিবিদ বা মতবাদীদের পরিভাষার উপর প্রাধান্য দিতে হবে।

২নং নীতি

কুরআন-সুন্নাহতে যে 'নাফি' (না-সূচক) খন্ডনমূলক বাক্য থাকে, তার অর্থ পরিপূর্ণতা বা পূর্ণাঙ্গতার খন্ডন। কিন্তু সে পূর্ণাঙ্গতার উদ্দেশ্য মুস্তাহাব নয়; বরং ওয়াজেব।

যেমন নবী ﷺ এক ব্যক্তির নামায পড়া দেখে বললেন, 'তুমি নামায পড়লে না। ফিরে গিয়ে পুনরায় পড়।'

তার মানে, তোমার নামায হল না। নামায পরিপূর্ণ বা পূর্ণাঙ্গ হল না। এই পরিপূর্ণতায় যেটা খামতি ছিল, সেটা মুস্তাহাব নয়, বরং ওয়াজেব।

কুরআন-সুন্নাহর বাক্যে এমনটাই বুঝতে হবে।

৩নং নীতি

কুরআন-সুন্নাহর আদেশ-নিষেধের একাধিক কর্মের সংযুক্ত বাক্যে কোন্‌টি ওয়াজেব এবং কোন্‌টি মুস্তাহাব অথবা কোন্‌টি হারাম এবং কোন্‌টি মকরূহ তা বুঝতে হবে।

যেমন মহানবী ﷺ বলেছেন,

((عَشْرٌ مِنَ الفِطْرَةِ : قَصُّ الشَّارِبِ ، وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ ، وَالسِّوَاكُ ، وَاسْتِنْشَاقُ الماءِ ، وَقَصُّ الأَظْفَارِ ، وَغَسْلُ البَرَاجِمِ ، وَنَتفُ الإِبْطِ ، وَحَلْقُ العَانَةِ ، وَانْتِقَاصُ الماءِ)). قَالَ الرَّاوِي : وَنَسِيْتُ العَاشِرَةَ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ المضمَضَةُ . قَالَ وَكِيعٌ – وَهُوَ أَحَدُ رُوَاتِهِ – انْتِقَاصُ الماءِ : يَعْنِي الاسْتِنْجَاءِ .

“দশটি কাজ প্রকৃতিগত আচরণ; (১) গোঁফ ছেঁটে ফেলা। (২) দাড়ি বাড়ানো। (৩) দাঁতন করা। (৪) নাকে পানি দিয়ে নাক পরিষ্কার করা। (৫) নখ কাটা। (৬) আঙ্গুলের জোড়সমূহ ধোয়া। (৭) বগলের লোম তুলে ফেলা। (৮) গুপ্তাঙ্গের লোম পরিষ্কার করা। (৯) পানি দ্বারা ইস্তেঞ্জা (শৌচকর্ম) করা।” বর্ণনাকারী বলেন, ১০নং আচরণটি ভুলে গেছি, তবে মনে হয়, তা কুল্লি করা হবে। বর্ণনাকারী অকী’ বলেন, ‘ইন্তিকাসুল মা’ মানে পানি দিয়ে ইস্তেঞ্জা করা। *(মুসলিম ৬২৭নং)*

উক্ত ১০টি কর্মসমূহের মধ্যে কোন্‌টি ওয়াজেব এবং কোন্‌টি মুস্তাহাব তা অন্যান্য দলীলের ভিত্তিতে বুঝতে হবে। সংযুক্তভাবে সবগুলির মান একই ধারণা করা ঠিক হবে না।

এ মর্মে তালেবে ইল্‌মকে আরো বেশি পড়াশোনা করতে হবে।

শরীয়তের হুকুম, আদেশ-নির্দেশসূচক বাক্য

১নং নীতি

আদেশসূচক বাক্য মূলতঃ অবশ্যপালনীয়। শরীয়তের বিধানে যার মান

ওয়াজেব।

যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন,

{فليحْذَرِ الذينَ يُخالِفُونِ عنْ أمْرِهِ أنْ تُصِيبَهُم فِتنةٌ أوْ يُصِيبَهُم عَذابٌ أليمٌ} النور ٦٣

"সুতরাং যারা তার আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় অথবা কঠিন শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করবে।" (নূর ঃ ৬৩)

এখানে আদেশ পালন যদি ওয়াজেব (আবশ্যিক) না হতো, তাহলে তা উপেক্ষা করাতে বিপর্যয় অথবা কঠিন শাস্তির হুমকি থাকত না।

যেমন মহানবী ﷺ বলেছেন,

((لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي – أَوْ عَلَى النَّاسِ – لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلاَةٍ)).

"যদি আমি আমার উম্মতের উপর বা লোকেদের উপর কঠিন মনে না করতাম, তাহলে প্রতিটি নামাযের সাথে দাঁতন করার আদেশ দিতাম।" *(বুখারী ৮৮৭, মুসলিম ৬১২নং)*

আর তারই অর্থ রয়েছে অন্য এক বর্ণনায়,

« لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَفَرَضْتُ عَلَيْهِمُ السِّوَاكَ مَعَ الْوُضُوءِ ».

"আমি আমার উম্মতের পক্ষে কষ্টকর না জানলে (প্রত্যেক) ওযুর সাথে দাঁতন করা ফরয করতাম।" *(হাকেম ৫১৬, বাইহাকী ১৪৬, সহীহুল জামে' ৫৩১৯নং)*

বোঝা গেল যে, তাঁর আদেশ পালন করা ফরয বা ওয়াজেব। আর তা পালন করা কষ্ট বলেই তিনি আদেশ বা ফরয করেননি।

কিন্তু আদেশের পরপর অথবা অন্য কোথাও কোন পার্শ্ব-সংকেত থাকলে ওয়াজেব থেকে মুস্তাহাব হয়ে যায়। অর্থাৎ, সে আদেশ পালন করা আবশ্যক থেকে উত্তম হয়ে যায়।

আর যে যে পার্শ্ব-সংকেতের কারণে ওয়াজেব মুস্তাহাব হয়ে যায়, তা নিম্নরূপ ঃ-

১। যে দলীলে আদেশ উল্লিখিত হয়েছে, তাতেই হেতু বর্ণনা ক'রে দেওয়া হয়েছে, যাতে বোঝা যায় যে, সে আদেশ পালন ওয়াজেব নয়, বরং মুস্তাহাব।

যেমন হাদীসে এসেছে,

((أَسْفِرُوا بِالْفَجْرِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ)).

"তোমরা ফজর উজ্জ্বল কর, কারণ তা সওয়াবের জন্য অধিক বড়।" *(আহমাদ ১৭২৮৬, তিরমিযী ১৫৪নং প্রমুখ)*

এখানে আদেশ পালন করলে সওয়াব বেশি হবে। আর বোঝা যায় যে, পালন

না করলে সওয়াব বেশি হবে না এবং তাতে গোনাহও হবে না। সুতরাং সে আদেশ পালন মুস্তাহাব।

২। অন্য কোন দলীল দ্বারা বোঝা যাবে যে, প্রথম দলীলের আদেশটি পালন করা ওয়াজেব নয়; বরং মুস্তাহাব।

((إِذَا لَقِيَ الرَّجُلُ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ فَلْيَقُلْ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ)).

"যখন কেউ তার ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করবে, তখন সে যেন বলে 'আস্-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ'।" (তিরমিযী ২৭২১নং)

উক্ত হাদীসে সালাম দেওয়ার সময় 'ওয়া রাহমাতুল্লাহ' বলা ওয়াজেব নয়। কারণ ইমরান ইবনে হুস্বাইন ﷺ বলেন, একটি লোক নবী ﷺ-এর নিকট এসে এভাবে সালাম করল 'আসসালামু আলাইকুম' আর নবী ﷺ তার জবাব দিলেন। অতঃপর লোকটি বসে গেলে তিনি বললেন, "ওর জন্য দশটি নেকী।" তারপর দ্বিতীয় ব্যক্তি এসে 'আসসালামু আলাইকুম অরহমাতুল্লাহ' বলে সালাম পেশ করল। নবী ﷺ তার সালামের উত্তর দিলেন এবং লোকটি বসলে তিনি বললেন, "ওর জন্য বিশটি নেকী।" তারপর আর একজন এসে 'আসসালামু আলাইকুম অরাহমাতুল্লাহি অবারাকাতুহ' বলে সালাম দিল। তিনি তার জবাব দিলেন। অতঃপর সে বসলে তিনি বললেন, "ওর জন্য ত্রিশটি নেকী।" *(আহমাদ ১৯৪৪৬, তিরমিযী ২৬৮৯, সহীহ আবু দাউদ ৪৩২৭, দারেমী ২৬৪০নং)*

বলা বাহুল্য, উক্ত হাদীসে নবী ﷺ প্রথম ব্যক্তিকে 'ওয়া রাহমাতুল্লাহ' বলতে আদেশ করেননি। আর এখান থেকে বোঝা গেল যে, প্রথম আদেশ পালন করা ওয়াজেব নয়; বরং মুস্তাহাব।

৩। মহানবী ﷺ-এর কাজে বা আমলে বোঝা যায় যে, সে ব্যাপারে তাঁর আদেশ অবশ্য পালনীয় নয়।

যেমন তিনি বলেছেন,

((الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ)).

"তোমরা তোমাদের লেবাসের মধ্যে সাদা কাপড় পরিধান কর। কারণ, তা সব চাইতে উত্তম। আর ঐ সাদা কাপড় দ্বারা তোমাদের ম্যাইয়্যেতকেও কাফনাও।" *(আহমাদ ২২১৯, ৩৪২৬, আবু দাউদ ৩৮৮০, ৪০৬৩, তিরমিযী ৯৯৪, ইবনে মাজাহ ৩৫৬৬নং)*

উক্ত হাদীসে সাদা কাপড় পরতে আদেশ করা হয়েছে। অথচ তিনি নিজে অন্য রঙের কাপড় পরিধান করেছেন।

যেমন আবূ রিমষা রিফাআহ তাইমী ﷺ বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরনে দুটো সবুজ রঙের চাদর দেখেছি।' *(আবূ দাউদ ৪২০৮, তিরমিযী ২৮১২নং)*

অনুরূপ জাবের বিন সামুরাহ ﷺ বলেন, 'আমি এক পূর্ণিমার রাতে নবী ﷺ-কে দেখলাম। আমি তাঁর চেহারার দিকে এবং চাঁদের দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম। তাঁর পরনে ছিল এক জোড়া লাল কাপড়। বলা বাহুল্য, তিনি ছিলেন আমার নিকট পূর্ণিমার চাঁদ অপেক্ষা বেশি সুন্দর।' *(তিরমিযী ২৮১১, দারেমী, মিশকাত ৫৭৯৪নং)*

বোঝা গেল, সাদা কাপড় পরার নির্দেশ পালন করা ওয়াজেব নয়।

৪। হাদীসের বর্ণনাকারীর তরফ থেকে এমন বয়ান আসে, যাতে বোঝা যায় যে, আদেশ পালন ওয়াজেব নয়। যেহেতু বর্ণনাকারী তাঁর বর্ণনার ব্যাখ্যা সম্বন্ধে বেশি বোঝেন।

যেমন আব্দুল্লাহ ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন,

((أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللِّحَى)).

"তোমরা গোঁফ কেটে ফেল এবং দাড়ি লম্বা কর।" *(বুখারী ৫৮৯৩, মুসলিম ৬২৩নং)*

আবার তাঁর ব্যাপারে বর্ণিত আছে যে, তিনি হজ্জ-উমরাতে ইহরাম থেকে হালাল হওয়ার সময় এক মুঠির বাইরে ছেঁটে ফেলতেন। (বুখারী ৫৮৯২নং)

বোঝা গেল, দাড়িকে নিজ অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া ওয়াজেব হলে, তিনি ছাঁটতেন না।

মনে রাখা ভালো যে, উক্ত ৪ প্রকার পার্শ্ব-সংকেত নিষেধ পালনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। অর্থাৎ, সে সবের কারণে নিষেধটি হারাম থেকে মাকরূহতে পরিণত হয়ে যাবে।

২নং নীতি

পার্শ্ব-সংকেতহীন আদেশ এই নির্দেশ দেয় যে, তা সাথে সাথে সত্বর পালন করতে হবে।

মহান আল্লাহ বলেন,

{ وسارِعُوا إلى مَغْفِرةٍ مِنْ رَبِّكُمْ } (آل عمران : ١٣٣)

"তোমরা প্রতিযোগিতা (ত্বরা) কর, তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে ক্ষমার জন্য।" (আলে ইমরান ঃ ১৩৩)

হুদাইবিয়ার সন্ধির সময়, সন্ধির পরে তিনি সাহাবাগণকে আদেশ দিলেন, 'তোমরা ওঠো এবং কুরবানী ক'রে মাথা মুন্ডন করো।' কিন্তু সন্ধি তাঁদের বিপক্ষে ধারণা ক'রে দুঃখে কোন সাহাবী উঠলেন না। তা দেখে নবী ﷺ রেগে গেলেন। (বুখারী ২৭৩২, মুসলিম ৪৭৩৩নং)

বোঝা গেল যে, আদেশ পালনে দেরি করা যাবে না। তা না হলে তিনি রাগান্বিত হতেন না।

৩নং নীতি

সাধারণ নির্দেশের দাবী হল, তা বারবার পালন করা। শরীয়তের অধিকাংশ আদেশ-নির্দেশের দাবী এমনই। যেমন ঃ-

"আল্লাহ ও রসূলের প্রতি ঈমান আনো।" (নিসা ঃ ১৩৬)

"আল্লাহর আনুগত্য করো এবং রসূলের আনুগত্য করো।" (মাইদাহ ঃ ৯২)

"আল্লাহকে ভয় করো।" (বাক্বারাহ ঃ ১৮৯)

"পরিমাপ ও ওজন ন্যায়ভাবে পুরাপুরি প্রদান কর।" (আন্‌আম ঃ ১৫২)

এই শ্রেণীর আরো অনেক। অবশ্য কোন নির্দেশ পালনের ধরন স্পষ্ট থাকলে, তার কথা স্বতন্ত্র।

যেমন যে নির্দেশ শর্তসাপেক্ষে বারবার করতে বলা হয়েছে, তা শর্তের সাথেই পালন করতে হবে।

যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন,

{يأيُّهَا الذِينَ آمَنُوا إذا قُمْتُمْ إلى الصَّلاةِ فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وأيْدِيَكُمْ} [المائدة : ٦]

"হে বিশ্বাসিগণ! যখন তোমরা নামাযের জন্য প্রস্তুত হবে, তখন তোমরা তোমাদের মুখমন্ডল ও কনুই পর্যন্ত হাত ধৌত কর এবং তোমাদের মাথা মাসাহ কর এবং পা গ্রন্থি পর্যন্ত ধৌত কর।" (মায়িদাহ ঃ ৬)

স্পষ্ট যে, উযূ নামাযের সাথে শর্তাবদ্ধ। অতএব নামাযের সাথে উযূর নির্দেশ বারবার পালিত হবে।

৪নং নীতি

যে আদেশ কোন নির্দিষ্ট কাজের সাথে যুক্ত হবে, সে আদেশ সেই কাজ শুরু করলে তবেই ওয়াজেব হবে।

যেমন হাদীসে এসেছে, "যখন তোমরা (পবিত্রতায়) ঢেলা ব্যবহার করবে, তখন বেজোড় সংখ্যক করো।" (বুখারী ১৬১, মুসলিম ৫৮৩নং)

বলা বাহুল্য, পবিত্রতায় ঢেলা ব্যবহার ওয়াজেব নয়। যেহেতু তাতে পানিও ব্যবহার করা যায়। কিন্তু ঢেলা ব্যবহার করলে বেজোড় সংখ্যক করা ওয়াজেব হবে।

৫নং নীতি

সাহাবীর উক্তি "আমরা এই কাজ করতে আদিষ্ট হয়েছি" অথবা "আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ এই কাজ করতে আদেশ দিয়েছেন" উক্ত কাজ ওয়াজেব হওয়ার দলীল।

যেহেতু এমন হাদীস শাব্দিক না হলেও আর্থিক। সুতরাং তার মান অগ্রাহ্য নয়।

৬নং নীতি

কোন কাজ করতে নিষেধের পর যদি আদেশ আসে, তাহলে নিষেধের পূর্বে সে কাজটির যে মান ছিল, সেই মান পাবে। ওয়াজেব থাকলে ওয়াজেব, মুস্তাহাব থাকলে মুস্তাহাব, নচেৎ মুবাহ থাকলে মুবাহ।

যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ} [المائدة : ٢]

"যখন তোমরা ইহরাম-মুক্ত হবে তখন শিকার করো।" (মায়িদাহ ঃ ২)

কাজটি হল শিকার করা। যা ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ হল। অতঃপর ইহরাম থেকে হালাল হয়ে তা করার আদেশ এল। শিকার করার কাজটা আসলে ছিল মুবাহ। সুতরাং সেটা আদেশের (অনুমতির) মাধ্যমে আবার মুবাহ হয়ে গেল।

৭নং নীতি

বাক্য যদি বিবৃতিসূচক হয় (আদেশসূচক না হয়), তাহলে তা যদি আদেশের অর্থ বহন করে, তাহলে তার মানও ওয়াজেব হবে। যেহেতু বাক্যের অর্থ ও উদ্দেশ্যই আসল, তার শব্দাবলী নয়।

যেমন ঃ-

((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)) (البقرة : ١٨٣)

"হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদের জন্য সিয়াম (রোযা) লেখা হলো, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীগণের জন্য লেখা হয়েছিল, যাতে তোমরা সংযমশীল হতে পারো।" (বাক্বারাহ ঃ ১৮৩)

'লেখা হলো' উদ্দেশ্য, ফরয করা হলো।

((السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ حَقٌ عَلَى المَرْءِ المسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ أَوْ كَرِهَ مَالَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ عَلَيْهِ وَلاَ طَاعَةَ)).

"প্রিয় বা অপ্রিয় (সকল) বিষয়ে আদেশ শোনা ও মানা প্রত্যেক মুসলিমের উপর (শাসকের) হক (অধিকার) রয়েছে; যতক্ষণ না সে পাপাচরণে আদিষ্ট হয়। কিন্তু যখন সে পাপাচরণে আদিষ্ট হবে, তখন না শুনবে, না মানবে।" (সিঃ সহীহাহ ৭৫২নং)

'হক বা অধিকার' উদ্দেশ্য, ওয়াজেব বা অবশ্য পালনীয়।

« مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ ».

"যে ব্যক্তি রোযা বাকী রেখে মারা যায়, তার পক্ষ থেকে তার অভিভাবক রোযা রেখে দেবে।" *(বুখারী ১৯৫২, মুসলিম ২৭৪৮নং)*

'রেখে দেবে' উদ্দেশ্য, যেন রাখে, রাখা ওয়াজেব।

৮নং নীতি

আদেশের বিধানের ক্ষেত্রে কোন পার্শ্ব-সংকেত বা সহযোগী ব্যাখ্যা থাকার ফলে তার অর্থ যদি ওয়াজেব থেকে ফিরে যায়, তাহলে মুস্তাহাবের অর্থ ধরতে হবে; মুবাহের অর্থ নয়। যেহেতু তা ওয়াজেবের কাছাকাছি স্তর।

অবশ্য যদি কোন পার্শ্ব-সংকেত থাকে, তাহলে মুবাহের অর্থে মানা যেতে পারে।

৯নং নীতি

কোন সাহাবীর আদেশ পালনের মান ওয়াজেব নয়।

যেহেতু সাহাবীর আদেশ মহানবী ﷺ-এর আদেশের মতো নয়।

১০নং নীতি

সাধারণ আদেশ একবার পালন করলেই হুকুম তামীল হয়ে যায়।

যেমন উযূর আদেশে মহান আল্লাহ বলেছেন,

{ فاغْسِلُوا وجُوهَكُمْ } [المائدة : ٦]

"তোমরা তোমাদের চেহারা ধৌত করো।" (মাইদাহ ঃ ৬)

একবার ধৌত করলেই আদেশ পালনের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়। একাধিকবার ধোয়া সুন্নত, আর সে কথা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

১১নং নীতি

কোন প্রশ্নের উত্তরে যে আদেশ আসে, তা প্রশ্নকারীর উদ্দেশ্য অনুযায়ী হবে। তা ওয়াজেবের অর্থে হবে না।

এমন অবস্থা দুইভাবে হতে পারে ঃ-

প্রথম এই যে, প্রশ্নটি হবে কর্মটির মান প্রসঙ্গে। সুতরাং তখন প্রশ্নকারীর উদ্দেশ্য অনুযায়ী কর্মটির মান নির্ধারণ করা হবে। তার উদ্দেশ্য যদি 'কর্মটি মুবাহ কি না' হয়, তাহলে উত্তরে আসা আদেশ মুবাহর অর্থে ধরে নিতে হবে, ওয়াজেবের অর্থে নয়। অন্যথা যদি তার উদ্দেশ্য 'কর্মটি ওয়াজেব কি না' হয়, তাহলে উত্তরে আসা আদেশটি ওয়াজেবের জন্য ধরে নিতে হবে।

যেমন বারা' বিন আযেব ﷺ-এর হাদীস। রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে উটের মাংস খেয়ে উযূ প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করা হলে, উত্তরে তিনি বললেন, "তার জন্য উযূ করো।" আর ছাগল-ভেড়ার মাংস খেয়ে উযূ প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করা হলে, উত্তরে তিনি বললেন, "তার জন্য উযূ করো না।"

তাঁকে উটের আস্তাবলে নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে উত্তরে তিনি বললেন, "তোমরা উটের আস্তাবলে নামায পড়ো না, কারণ উট শয়তানী উপাদান থেকে সৃষ্ট।" আর ছাগল-ভেড়ার গোয়ালে নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে উত্তরে তিনি বললেন, "ছাগল-ভেড়ার গোয়ালে নামায পড়, কারণ তা হল বর্কত।" *(আহমাদ ১৮৫৩৮, আবূ দাউদ ১৮৪, ৪৯৩নং)*

সুতরাং উটের মাংস খেয়ে উযূর ব্যাপারে "তার জন্য উযূ করো"---এই আদেশ ওয়াজেবের অর্থে। যেহেতু প্রশ্নকারীর উদ্দেশ্য ছিল, 'উটের মাংস খেলে উযূ নষ্ট হবে কি না?' আর যাতে উযূ নষ্ট হয়, তাতে উযূ করা ওয়াজেব হয়।

পক্ষান্তরে ছাগল-ভেড়ার গোয়ালে নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসার ব্যাপারে "ছাগল-ভেড়ার গোয়ালে নামায পড়, কারণ তা হল বর্কত"---এই আদেশ ওয়াজেবের অর্থে নয়। কারণ এতে প্রশ্নকারীর উদ্দেশ্য ছিল, 'ছাগল-ভেড়ার গোয়ালে নামায পড়া বিধেয় কি না?' তাই তার অর্থ হবে নামায পড়া বিধেয়, বিধিসম্মত, মুবাহ

বা জায়েয।

দ্বিতীয় অবস্থা এই যে, কেমনত্ব (প্রক্রিয়া, পদ্ধতি) প্রসঙ্গে প্রশ্নের পর উত্তর আদেশসূচক হলে আসলে যে কাজের কেমনত্ব জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে, তা ওয়াজেব হলে আদেশের মান হবে ওয়াজেব। পক্ষান্তরে যদি মূলতঃ সেই কেমনত্ব বিষয়ক কাজ ওয়াজেব না হয়, তাহলে আদেশের মান ওয়াজেব হবে না।

যেমন যার কেমনত্ব ওয়াজেব, তার উদাহরণ ঃ কা'ব বিন উজরা ﷺ-এর হাদীস। তিনি বলেন, নবী ﷺ (একদা) আমাদের নিকট এলেন। আমরা বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! (নামাযে) আপনার প্রতি কিভাবে সালাম পেশ করতে হয় তা জেনেছি, কিন্তু আপনার প্রতি দরূদ কিভাবে পাঠাব?' উত্তরে তিনি বললেন, "তোমরা বলো, আল্লা-হুম্মা স্বাল্লি আলা মুহাম্মাদিউ ওয়া আলা আ-লি মুহাম্মাদ----।" *(বুখারী ৩৩৭০, ৬৩৫৭, মুসলিম ৯৩৫নং)*

বলা বাহুল্য, যে কাজের পদ্ধতি জিজ্ঞাসা করা হলো তা হলো নামাযে দরূদ। আর আসলে তা (প্রথম তাশাহ্হুদে) ওয়াজেব। সুতরাং উক্ত আদেশের মান হবে ওয়াজেব।

আর জিজ্ঞাসিত যে পদ্ধতি আসলে ওয়াজেব নয়, তার উদাহরণ হলো, আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)র হাদীস। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, '(কবর যিয়ারতে কবরবাসীর জন্য) কীভাবে দুআ বলব হে আল্লাহর রসূল?' উত্তরে তিনি বললেন, "বলবে, আস্সালামু আলা আহলিদ দিয়ারি----।" (মুসলিম ২৩০ ১নং)

বলা বাহুল্য, কবর যিয়ারতে দুআ আসলে ওয়াজেব নয়। সুতরাং উক্ত দুআ বলার আদেশ ওয়াজেব নয়, মুস্তাহাব।

নিষেধসূচক বাক্য

১নং নীতি

কোন কিছু নিষেধ, মানা বা বারণ মানেই, তা হারাম।

অবশ্য কোন পার্শ্ব-সংকেত থাকলে তার অর্থ মকরূহও হতে পারে।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

((دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ ، إِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَثْرَةُ سُؤَالِهِمْ واخْتِلافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ ، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ)).

"আমি যে ব্যাপারে তোমাদেরকে (বর্ণনা না দিয়ে) ছেড়ে দিয়েছি, সে ব্যাপারে তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও (অর্থাৎ, সে ব্যাপারে আমাকে প্রশ্ন করো না)। কারণ, তোমাদের পূর্ববর্তীরা তাদের অধিক প্রশ্ন করার এবং তাদের নবীদের সঙ্গে মতভেদ করার ফলে ধ্বংস হয়ে গেছে। সুতরাং আমি যখন তোমাদেরকে কোন জিনিস থেকে নিষেধ করব, তখন তোমরা তা হতে দূরে থাকবে। আর যখন আমি তোমাদেরকে কোন কাজের আদেশ দেব, তখন তোমরা তা সাধ্যমতো পালন করবে।" *(বুখারী ৭২৮৮, মুসলিম ৩৩২ ১নং)*

বলা বাহুল্য, মূলতঃ নিষেধ হল 'মকরূহে তাহরীমী' বা হারামের অর্থে। অন্য দলীল দ্বারা সে অর্থ থেকে 'মকরূহে তানযীহী'র অর্থও হতে পারে।

জ্ঞাতব্য যে, অধিকাংশ উলামার রায়ে কোন হারাম মকরূহে পরিণত হবে না; যতক্ষণ না ইজমা' হয়েছে। যেমন ইবাদতের ক্ষেত্রে নিষেধের অর্থ হারাম এবং আদব ও শিষ্টাচারের ক্ষেত্রে তা মকরূহ, এমন কথার কোন দলীল নেই।

২নং নীতি

যা নিষিদ্ধ, তা করলে, তা অশুদ্ধ ও বাতিল।

ইহরাম অবস্থায় বিবাহবন্ধন নিষেধ। কেউ করলে তা বাতিল। উমার বিন খাত্ত্বাব ﵁ এই ফায়সালাই দিয়েছেন। (বাইহাক্বীর কুবরা ৭/৪৪১)

জায়বদলী বা বিনিময়-বিবাহ বিনা পৃথক মোহরে বৈধ নয়। এ ওর বোন বা বেটিকে এবং ও এর বোন বা বেটীকে বিনিময় ক'রে পাত্রীর বদলে পাত্রীকে মোহর বানিয়ে বিবাহ ইসলামে হারাম। *(বুখারী, মুসলিম ইত্যাদি)*

মুআবিয়া ﵁ এমন বিবাহের বিবাহিত বর-কনের মাঝে বিচ্ছেদের ফায়সালা দিয়েছেন।

নিষিদ্ধ সময়ের নামায-রোযা শুদ্ধ নয়। ইত্যাদি।

৩নং নীতি

কোন প্রশ্নের উত্তরে যে নিষেধ আসে, তা প্রশ্নকারীর উদ্দেশ্য অনুযায়ী হবে। তা হারামের অর্থে হবে না।

প্রশ্নটি হবে কর্মটির মান প্রসঙ্গে। সুতরাং তখন প্রশ্নকারীর উদ্দেশ্য অনুযায়ী

কর্মটির মান নির্ধারণ করা হবে। তার উদ্দেশ্য যদি 'কর্মটি মুবাহ কি না' হয়, তাহলে উত্তরে আসা নিষেধকে হারামের অর্থে ধরে নিতে হবে। অন্যথা যদি তার উদ্দেশ্য 'কর্মটি ওয়াজেব কি না' হয়, তাহলে উত্তরে আসা নিষেধটি ওয়াজেব নয় অর্থে ধরে নিতে হবে।

যেমন বারা' বিন আযেব ﷺ-এর হাদীস। রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে উটের মাংস খেয়ে উযূ প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করা হলে, উত্তরে তিনি বললেন, "তার জন্য উযূ করো।" আর ছাগল-ভেড়ার মাংস খেয়ে উযূ প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করা হলে, উত্তরে তিনি বললেন, "তার জন্য উযূ করো না।"

তাঁকে উটের আস্তাবলে নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে উত্তরে তিনি বললেন, "তোমরা উটের আস্তাবলে নামায পড়ো না, কারণ উট শয়তানী উপাদান থেকে সৃষ্ট।" আর ছাগল-ভেড়ার গোয়ালে নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে উত্তরে তিনি বললেন, "ছাগল-ভেড়ার গোয়ালে নামায পড়, কারণ তা হল বর্কত।" *(আহমাদ ১৮৫৩৮, আবূ দাউদ ১৮৪, ৪৯৩নং)*

সুতরাং ছাগল-ভেড়ার মাংস খেয়ে উযূর ব্যাপারে "তার জন্য উযূ করো না"---এই নিষেধ ওয়াজেব নয়-এর অর্থে। যেহেতু প্রশ্নকারীর উদ্দেশ্য ছিল, 'ছাগল-ভেড়ার মাংস খেলে উযূ নষ্ট হবে কি না?' আর যাতে উযূ নষ্ট হয় না, তাতে উযূ করা ওয়াজেব নয়।

পক্ষান্তরে উটের আস্তাবলে নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসার ব্যাপারে "উটের আস্তাবলে নামায পড়ো না, কারণ উট শয়তানী উপাদান থেকে সৃষ্ট।"---এই নিষেধ হারামের অর্থে। কারণ এতে প্রশ্নকারীর উদ্দেশ্য ছিল, 'উটের আস্তাবলে নামায পড়া বিধেয় কি না?' তাই তার অর্থ হবে নামায পড়া বৈধ নয়, হারাম।

আম-খাস

১নং নীতি

খাসের দলীল পাওয়া গেলে আমকে খাস করা যায়। কিন্তু আমের কিছু অংশের উল্লেখ-সহ কোন খাসের দলীল পাওয়া গেলে উল্লিখিত অংশ দ্বারা আম উক্তিকে কোন পার্শ্ব-সংকেত ছাড়া খাস করা যায় না।

উদাহরণ স্বরূপ ঃ-

((لاَ صَلاَةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ ، وَلاَ وَهُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ)) .

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, "খাবার হাযির থাকা কালীন অবস্থায় নামায নেই, আর পেশাব পায়খানার চাপ সামাল দেওয়া অবস্থায়ও নামায নেই।" *(মুসলিম ১২৭৪নং)*

উক্ত হাদীস থেকে বোঝা যায় যে, আমভাবে যে কোন খাবার হাযির থাকলে তা রেখে নামায শুদ্ধ নয়। চাহে সে খাবার দুপুরের হোক অথবা রাতের।

কিন্তু ইবনে উমার ﷺ-এর হাদীসে বলা হয়েছে,

« إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ».

"যখন তোমাদের কারো রাতের খাবার রাখা হবে এবং নামাযের ইকামত হয়ে যাবে, তখন রাতের খাবার আগে খাও।" (বুখারী ৬৭৩, মুসলিম ১২৭২নং)

উক্ত হাদীসে রাতের খাবারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তাহলে আয়েশার হাদীসে উল্লিখিত 'খাবার' মানে কি 'রাতের খাবার'?

আসলে তা নয়। সুতরাং সাহাবাগণের আমল ছিল আম খাবারের উপর।

তদনুরূপ হাদীসে আমভাবে এসেছে, "যে কোনও চামড়া প্রক্রিয়াজাত করা হবে, পবিত্র হয়ে যাবে।" (তিরমিযী ১৭২৮, ইবনে মাজাহ ৩৬০৯নং)

কিন্তু অন্য এক হাদীসে ছাগলের চামড়ার ক্ষেত্রে বলা হয়েছে, 'প্রক্রিয়াজাত করলে তা পবিত্র হয়ে যায়।' (আহমাদ ২০০৩, আবূ দাউদ ৪১২২নং)

বলা বাহুল্য, ভিন্ন বর্ণনায় ছাগলের চামড়ার কথা উল্লিখিত থাকলেও, প্রক্রিয়াজাত ক'রে কেবল ছাগলেরই চামড়া পবিত্র ও ব্যবহারযোগ্য হয় না; বরং আমভাবে সকল প্রাণীর চামড়ার ক্ষেত্রে ব্যাপক বিধান অবশিষ্ট থাকবে।

২নং নীতি

আম বিধানের ক্ষেত্রে মৌলিক নীতি হল, আমভাবেই আমল করতে হবে, যতক্ষণ না খাস হওয়ার দলীল পাওয়া যায়।

এমনই আমল ছিল সাহাবাগণের। মহান আল্লাহ বলেছেন,

[الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ] {الأنعام:٨٢}

"যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে যুলুম দ্বারা কলুষিত করেনি, নিরাপত্তা তাদেরই জন্য এবং তারাই সৎপথপ্রাপ্ত। (আন্আম ঃ ৮২)

যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হল, তখন সাহাবায়ে কেরাম ﷺ যুলুমের সাধারণ

অর্থ (অবজ্ঞা, ত্রুটি, পাপ এবং অত্যাচার ইত্যাদি) মনে ক'রে বড়ই অস্থির হয়ে পড়লেন এবং রসূল ﷺ-এর কাছে এসে বলতে লাগলেন, أَيُّنَا لَمْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ 'আমাদের মধ্যে এমন কেই বা আছে, যে যুলুম করেনি?' তখন রসূল ﷺ বললেন, "এ থেকে উদ্দেশ্য সে যুলুম নয়, যেটা তোমরা মনে করছ, বরং এ থেকে উদ্দেশ্য শির্ক। যেমন, লুকমান ﷺ তাঁর ছেলেকে বলেছিলেন,

{إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ}(لقمان: ١٣)

"অবশ্যই শির্ক হল বড় যুলুম।" (বুখারী ৩২নং)

সুতরাং আয়াতের ব্যাপক অর্থ গ্রহণ সাহাবাগণ বুঝেছিলেন। কিন্তু নবী ﷺ তা যে খাস অর্থে অবতীর্ণ হয়েছে, তা স্পষ্ট করলেন।

ইমাম শাফেয়ী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, 'অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি হাদীস শুনবে, তার উচিত তার ব্যাপক অর্থের উপর আমল করা; যতক্ষণ না পার্থক্যের কোন দলীল পেয়েছে।' (আল-উম্ম্ ৭/২৬৯)

৩নং নীতি

আম বিধানের উপর আমল তখনই আম হিসাবে করা যাবে, যখন সলফ কর্তৃক অনুরূপ আম আমল প্রমাণিত হবে।

৪নং নীতি

বাচ্যার্থের ব্যাপকতাই লক্ষণীয়, কারণবিষয়ক ঘটনার বিশেষত্ব নয়।

العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب.

এক দল সাহাবী উল্লেখ করলেন, তাঁরা সমুদ্র সফরে থাকলে তাঁদের কাছে যে পানি থাকে, তা কেবল পানের জন্য যথেষ্ট, পবিত্রতার জন্য নয়। তাহলে কি সমুদ্রের (লবণাক্ত) পানি পবিত্রতায় ব্যবহার করা তাঁদের জন্য বৈধ হবে? মহানবী ﷺ উত্তরে বললেন, "সমুদ্রের পানি পবিত্র।" *(আহমাদ ৮৭৩৫, আবূ দাউদ ৮৩, তিরমিযী ৬৯, নাসাঈ ৫৯, ইবনে মাজাহ ৩৮৬নং)*

সমুদ্রের পানি পবিত্র। এ ব্যাপারে সাহাবাগণের ব্যাপকতার ফতোয়া আছে। তার মানে হাদীসে যে কারণ বর্ণনা করা হয়েছে, সে কারণ বা প্রয়োজনীয়তা না থাকলেও সমুদ্রের পানিতে পবিত্রতা অর্জন করা যাবে। সঙ্গে মিষ্টি পানি বেশি থাকলেও পবিত্রতায় সমুদ্রের পানি ব্যবহার করা যাবে, সফরে না থেকে বাড়ির পাশে সমুদ্র থাকলেও তার পানি ব্যবহার করা যাবে।

৫নং নীতি

যে আম নির্দেশে ভিন্ন সম্ভাবনা আছে, তাতে তফসীল জিজ্ঞাসা না ক'রে আমভাবে আমল করা কর্তব্য।

গাইলান সাক্বাফী যখন ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন তাঁর দশটি স্ত্রী ছিল। নবী ﷺ তাঁকে বললেন, 'ওদের মধ্যে ৪টি গ্রহণ করো এবং বাকিদেরকে বর্জন করো।" (তিরমিযী ১১২৮, ইবনে মাজাহ ১৯৫৩নং)

অতঃপর তিনি বিস্তারিতভাবে এ কথা জানতে চাইলেন না যে, কোন্ চারটিকে তিনি রাখবেন এবং কোন্ ছয়টিকে তিনি বর্জন করবেন? যাদেরকে আগে বিবাহ করেছেন তাদেরকে রাখবেন, নাকি যাদেরকে পরে বিবাহ করেছেন?

বলা বাহুল্য, আমভাবে যেটা বাচ্যার্থে বোঝা যায়, তা হল, যে কোনও চারটিকে রেখে বাকিগুলিকে বর্জন করা যায়।

৬নং নীতি

বিরল প্রকার খাস বিষয় আমের মধ্যেই প্রবিষ্ট থাকবে।

খাস করার কোন উপযুক্ত দলীল না পাওয়া গেলে তা আমের মধ্যেই প্রবিষ্ট হবে।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

[وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ] {الأنبياء:٣٤}

"আমি তোমার পূর্বে কোন মানুষকে অনন্ত জীবন দান করিনি; সুতরাং তোমার মৃত্যু হলে তারা কি চিরজীবী হয়ে থাকবে?" (আম্বিয়া ঃ ৩৪)

আর ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ নিজ জীবনের অন্তিম দিনগুলির কোন একদিন (লোকেদেরকে নিয়ে) এশার নামায পড়লেন এবং যখন সালাম ফিরলেন, তখন বললেন,

((أَرَأَيْتَكُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ ؟ فَإِنَّ عَلَى رَأسِ مِئَةِ سَنَةٍ لاَ يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ علَى ظَهْرِ الأَرْضِ اليَومَ أَحَدٌ)).

"আচ্ছা বলত। এটা তোমাদের কোন রজনী? (এ কথা) সুনিশ্চিত যে, যে ব্যক্তি আজ ধরাপৃষ্ঠে জীবিত আছে, একশত বছরের মাথায় সে ব্যক্তি অবশিষ্ট থাকবে না (অর্থাৎ, মারা যাবে)।" *(বুখারী ১১৬, ৫৬৪, ৬০১, মুসলিম ৬৬৪২নং)*

এই ব্যাপতার মাঝে খাযিরও প্রবিষ্ট। যেমন জাস্সাস-ওয়ালা দাজ্জালও প্রবিষ্ট।

শয়তান প্রবিষ্ট নয়, কারণ সে 'মানুষ' নয়।
অনুরূপ হিজড়া প্রবিষ্ট ক্বিসাস ও মীরাসের আয়াতের আম বিধানে।

৭নং নীতি

প্রত্যেক আমের মধ্যে খাস কিছু আছে, এ কথা সঠিক নয়।

প্রত্যেক নীতির ব্যতিক্রমিতা আছে, এ কথাও সঠিক নয়। যেহেতু উপযুক্ত দলীল ছাড়া সে কথা প্রমাণিত হবে না। আর কিতাব ও সুন্নাহতে এমন বহু আম কথা আছে, যার কোন খাস নেই।

৮নং নীতি

সর্বাবস্থায় আমের উপর খাস প্রাধান্য পাবে; চাহে আম নির্দেশ আগে আসুক অথবা পরে।

সাহাবাগণ এমনটাই করতেন।

নবী-কন্যা ফাতেমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) পিতার ইন্তিকালের পর মীরাসের আম বিধান অনুসারে প্রথম খলীফা আবূ বাক্র সিদ্দীকের কাছে এসে নিজ ভাগ চাইলেন। কিন্তু তিনি তাঁকে তা দিলেন না। কারণ তাঁর কাছে খাসের দলীল ছিল, নবী ﷺ বলেছেন,

« مَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ ».

"আমাদের কেউ ওয়ারেস হয় না। আমরা যা ছেড়ে যাই, তা সদকা।" *(বুখারী ৩০৯২-৩০৯৩, মুসলিম ৪৬৭৮নং)*

তিনি এটা দেখলেন না যে, কোন্ বিধানটি আগে এসেছে; আম নাকি খাস?

৯নং নীতি

বাক্যের পূর্বাপর বাগ্ধারা দ্বারা আমকে খাস করা যায়।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

[وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ] {الأعراف:١٦٣}

"সাগর সৈকতে অবস্থিত জনপদ সম্বন্ধে তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর, তারা শনিবারে সীমালংঘন করত। যখন উক্ত শনিবারে তাদের কাছে পানির উপর মাছ ভেসে আসত এবং শনিবার ভিন্ন অন্য দিন আসত না। তারা অবাধ্য ছিল

বলেই আমি এভাবে তাদের পরীক্ষা নিই।" (আ'রাফ ঃ ১৬৩)

বিদিত যে, জনপদ সীমালংঘন করতে পারে না বা অবাধ্য হতে পারে না। উদ্দেশ্য জনপদের অধিবাসী।

হাদীসে এসেছে, "খালা মায়ের মর্যাদায়।" (বুখারী ২৬৯৯নং)

কোন্ বিষয়ে? মীরাসের ক্ষেত্রেও কি খালা মায়ের মর্যাদায় হবে?

হাদীসের পূর্বাপর বাগ্ধারা তার উত্তর দেবে। হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় রাসুলুল্লাহ ﷺ মক্কা থেকে বের হলে হামযার কন্যা তাঁদের পিছু ধরে ডাক দিল, 'চাচাজী! চাচাজী' তা দেখে আলী তার হাত ধরলেন এবং ফাতেমাকে বললেন, 'এই নাও তোমার চাচার মেয়ে, আমি ওকে তুলে এনেছি।' অতঃপর আলী, যায়দ ও জা'ফর মেয়েটির ব্যাপারে বিতর্কে জড়িয়ে পড়লেন। আলী বললেন, 'আমি তার অধিক হকদার, কারণ সে আমার চাচার মেয়ে।' জা'ফরও বললেন, 'সে আমার চাচার মেয়ে এবং তার খালা আমার স্ত্রী।' যায়দ বললেন, 'সে আমার ভাইয়ের মেয়ে (ভাইঝি)।'

সুতরাং নবী ﷺ ফায়সালা দিয়ে বললেন, "(জা'ফরকে দেওয়া হোক। কারণ) খালা হল মায়ের মর্যাদায়।"

বলা বাহুল্য, হাদীসের বাগ্ধারা স্পষ্ট করে যে, সে মর্যাদা হল প্রতিপালনের দায়িত্বে।

১০নং নীতি

প্রচলিত প্রথা বা পরিভাষা দিয়ে শরীয়তের আম দলীলকে খাস করা যাবে না। যেহেতু শরীয়তের পরিভাষাতেই তা বুঝতে ও মানতে হবে।

১১নং নীতি

সাহাবীর উক্তি আমকে খাস করতে পারে।
যেহেতু তিনি শরীয়তের উদ্দেশ্য বেশি বোঝেন।

১২নং নীতি

নিজ জ্ঞান-বিবেক দ্বারা কোন আমকে খাস করা যাবে না।

১৩নং নীতি

কিয়াস দ্বারা কোন আমকে খাস করা যাবে না।

১৪নং নীতি

যে বিধানকে আম ও ব্যাপক রাখা হয়েছে, তাকে কোন সময়, স্থান, সংখ্যা, পদ্ধতি ইত্যাদি দ্বারা খাস করা যাবে না। যেমন যে বিধানকে খাস ও নির্ধারিত বা সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে, তাকে কোনভাবে আম করা যাবে না।

যেমন যে যিক্‌র আমভাবে করতে বলা হয়েছে, সে যিক্‌র কোন নির্দিষ্ট সময়, স্থান, সংখ্যা বা পদ্ধতির সাথে খাস করা যাবে না। তদনুরূপ যে যিক্‌র কোন সময়, স্থান, সংখ্যা বা পদ্ধতির সাথে সীমাবদ্ধ, তাকে আম করা যাবে না।

১৫নং নীতি

শরীয়তের যে নির্দেশ রাসলুল্লাহ ﷺ-কে দেওয়া হয়েছে বা তাঁকে সম্বোধন ক'রে বলা হয়েছে, তা উম্মতের জন্য আম। তবে কোন দলীল দ্বারা যদি খাস প্রমাণিত হয়, তাহলে ভিন্ন কথা।

এমনটাই সাহাবা ﷺ-গণ বুঝতেন। যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন,

[يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ] {التَّحريم:١}

"হে নবী! আল্লাহ তোমার জন্য যা বৈধ করেছেন, তুমি তা অবৈধ করছ কেন? তুমি তোমার স্ত্রীদের সন্তুষ্টি চাচ্ছ? আর আল্লাহ চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (তাহরীম ঃ ১)

ইবনে আব্বাস ﷺ বলেছেন, 'কেউ কিছু হারাম করলে কাফ্‌ফারা দিতে হবে।' এবং বলেছেন,

[لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَاليَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيرًا] {الأحزاب:٢١}

"তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও পরকালকে ভয় করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্য রাসূলুল্লাহর (চরিত্রের) মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে।" *(আহযাব ঃ ২১, বুখারী ৪৯১১নং)*

১৬নং নীতি

শরীয়তের একজনকে দেওয়া নির্দেশ আমভাবে সকল উম্মতের জন্য পালনীয়। অবশ্য খাস হওয়ার দলীল থাকলে আলাদা কথা।

মুআয ﷺ থেকে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর হাত ধরে বললেন,

((يَا مُعَاذُ ، وَاللهِ ، إِنِّي لأُحِبُّكَ ، ثُمَّ أُوصِيكَ يَا مُعَاذُ لاَ تَدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ تَقُولُ : اللَّهُمَّ أعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ ، وَشُكْرِكَ ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ)).

"হে মুআয! আল্লাহর কসম! নিঃসন্দেহে আমি তোমাকে ভালবাসি। অতঃপর আমি তোমাকে অসিয়ত করছি, হে মুআয! তুমি প্রত্যেক নামাযের পশ্চাতে এ শব্দগুলি বলা ছাড়বে না, 'আল্লা-হুম্মা আইন্নী আলা যিক্‌রিকা অশুকরিকা অহুস্‌নি ইবা-দাতিক।" (অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তোমার যিক্‌র করার, তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার এবং উত্তমরূপে তোমার ইবাদত করার ব্যাপারে আমাকে সাহায্য কর।) *(আবূ দাউদ ১৫২৪, নাসায়ী ১৩০৩নং)*

উক্ত নির্দেশ মুআযের জন্য থাকলেও তা সকল উম্মতের জন্য আম। সেহেতু মুআয তাঁর শিষ্য সুনাবিহীকে একই অসিয়ত ক'রে গেছেন এবং তিনি সেটা তাঁর জন্য খাস মনে করেননি।

১৭নং নীতি

যে নির্দেশ বা সম্বোধন পুরুষদের প্রতি, তা মহিলাদের প্রতিও প্রযোজ্য। অবশ্য খাস করার কোন দলীল থাকলে, তা ভিন্ন কথা।

১৮নং নীতি

কয়েকটি বাক্যের পর এক্সেপশন (ছাড় বা ব্যতীক্রমীর বর্ণনা) এলে তা পূর্বোক্ত সকল বাক্যের ক্ষেত্রে হবে।

যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন,

(وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ)(٤)

"যারা সাধ্বী রমণীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে, অতঃপর স্বপক্ষে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদেরকে আশি বার কশাঘাত করবে এবং কখনও তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না; এরাই তো সত্যত্যাগী।" (নূর ঃ ৪)

এর পরের আয়াতে এসেছে ব্যতিক্রমী ছাড়। বলা হয়েছে,

(إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (٥) سورة النور

"যদি এর পর ওরা তওবা করে ও নিজেদের কার্য সংশোধন করে, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (নূর ঃ ৫)

ইবনে তাইমিয়্যাহ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, 'এটি অপবাদ আরোপের

আয়াতের উভয় বাক্যের প্রতি প্রযোজ্য।' (মাজমূউ ফাতাওয়া ৩১/ ১৬৭)

মহানবী ﷺ বলেছেন,

« وَلاَ يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِى سُلْطَانِهِ وَلاَ يَقْعُدْ فِى بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ».

"আর কোন ব্যক্তি যেন কারো ইমামতির জায়গায় ইমামতি না করে এবং কারো আসনে না বসে, তার অনুমতি ছাড়া।" *(আহমাদ ১৭০৬৩, মুসলিম ১৫৬৪-১৫৬৬, আবু দাউদ ৫৮২, তিরমিযী ২৩৫, নাসাঈ ৭৮০, ইবনে মাজাহ ৯৮০নং)*

'তার অনুমতি ছাড়া' কথাটি ইমামতি করা এবং আসনে বসা, উভয় বাক্যের প্রতি ইঙ্গিত করে।

তদনুরূপ তিনি বলেছেন,

((أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى أَعْجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوَى)).

"শোনো! আরবীর উপর অনারবীর এবং অনারবীর উপর আরবীর, কৃষ্ণকায়ের উপর শ্বেতকায়ের এবং শ্বেতকায়ের উপর কৃষ্ণকায়ের কোন শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা নেই। শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা আছে তো কেবল 'তাক্বওয়া'র ভিত্তিতেই।" *(মুসনাদে আহমাদ ২৩৪৮৯, বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান ৫১৩৭নং)*

অর্থাৎ, আরবীর উপর অনারবীর শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা আছে তো কেবল 'তাক্বওয়া'র ভিত্তিতেই।

অনারবীর উপর আরবীর শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা আছে তো কেবল 'তাক্বওয়া'র ভিত্তিতেই।

কৃষ্ণকায়ের উপর শ্বেতকায়ের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা আছে তো কেবল 'তাক্বওয়া'র ভিত্তিতেই।

এবং শ্বেতকায়ের উপর কৃষ্ণকায়ের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা আছে তো কেবল 'তাক্বওয়া'র ভিত্তিতেই।

ভাবার্থ

অনেক সময় দলীলের শব্দে নির্দিষ্ট বিষয়ের বিধান স্পষ্ট থাকে না। কিন্তু তার ভাবার্থে সে কথা স্পষ্ট বোঝা যায়।

১নং নীতি

যে ভাবার্থ শব্দের বা বাক্যের অনুকূল, তা এক প্রকার দলীল।

শরীয়তের দলীলে অনেক সময় এমন শব্দ আসে, যার ভাবার্থে এমন কিছুর বিধান বুঝা যায়, যার জন্য কোন শব্দ উল্লিখিত নেই। তার বিধান হয়, তারই অনুরূপ অথবা তার থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

যেমন মহান আল্লাহ স্পষ্ট বলেছেন, 'তোমরা পিতামাতাকে উঃ বলো না।' (ইসরা' ঃ ২৩)

এই শব্দাবলীতে তাদেরকে মারধর করতে নিষেধ করা হয়নি। কিন্তু এর ভাবার্থ আমাদেরকে সূচিত করে যে, তা অধিকভাবে নিষিদ্ধ।

'তোমরা দারিদ্র্য-ভয়ে তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করো না।' (আনআম ঃ ১৫১, ইসরা' ঃ ৩১)

অনুকূল ভাবার্থে এ কথা স্পষ্ট হয় যে, দারিদ্র্যের ভয় না থাকলে হত্যার নিষেধ আরো কঠোর।

২নং নীতি

বিপরীতধর্মী ভাবার্থও এক প্রকার দলীল।

যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন,

{فليْسَ عَليْكُمْ جُنَاحٌ أنْ تَقصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إنْ خِفْتُمْ أنْ يَفْتِنكُمُ الذينَ كَفَرُوا} [النساء : ١٠١]

"তোমরা যখন দেশ-বিদেশে সফর করবে, তখন যদি তোমাদের আশংকা হয় যে, অবিশ্বাসিগণ তোমাদেরকে বিপন্ন করবে, তাহলে নামায কসর (সংক্ষিপ্ত) করলে তোমাদের কোন দোষ নেই।" (নিসা ঃ ১০১)

এই বিধানের বিপরীতধর্মী ভাবার্থ হল, 'যদি তোমাদের আশংকা না হয় যে, অবিশ্বাসিগণ তোমাদেরকে বিপন্ন করবে, তাহলে নামায কসর (সংক্ষিপ্ত)

করলে তোমাদের দোষ আছে।'

এই ভাবার্থই বুঝেছিলেন সাহাবাগণ এবং নবী ﷺ-এর স্বীকৃতিও ছিল এই বুঝাতে। সুতরাং একদা য়্যা'লা বিন উমাইয়া ﷺ উমার ﷺ-কে বলেন, কী ব্যাপার যে, লোকেরা এখনো পর্যন্ত নামায কসর পড়েই যাচ্ছে, অথচ মহান আল্লাহ তো কেবল বলেছেন যে, "তোমরা যখন দেশ-বিদেশে সফর করবে, তখন যদি তোমাদের আশংকা হয় যে, অবিশ্বাসিগণ তোমাদেরকে বিপন্ন করবে, তাহলে নামায কসর (সংক্ষিপ্ত) করলে তোমাদের কোন দোষ নেই।" আর বর্তমানে তো ভয়-ভীতির সে পরিস্থিতি অবশিষ্ট নেই?

উমার ﷺ উত্তরে বললেন, যে ব্যাপারে তুমি আশ্চর্যবোধ করছ, আমিও সেই ব্যাপারে আশ্চর্যবোধ করে নবী ﷺ-এর নিকট এ কথার উল্লেখ করলে তিনি বললেন,

« صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ ».

"এটা তোমাদেরকে দেওয়া আল্লাহর একটি সদকাহ। সুতরাং তোমরা তাঁর সদকাহ গ্রহণ কর।" *(আহমাদ, মুসলিম ১৬০৫, মিশকাত ১৩৩৫নং)*

এ বিধানে বিপরীতমুখী ভাবার্থ আমলযোগ্য নয়, যেহেতু মহান আল্লাহর সদকাহ গ্রহণ করতে হবে তাই। সে কথা মহানবী ﷺ স্পষ্ট ক'রে দিয়েছেন।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

[فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ] {التوبة:١١}

"অতঃপর তারা যদি তওবা করে, যথাযথ নামায পড়ে ও যাকাত দেয়, তাহলে তারা তোমাদের দ্বীনী ভাই।" (তাওবাহ ঃ ১১)

এর বিপরীতধর্মী ভাবার্থ হল, "অতঃপর তারা যদি তওবা না করে, যথাযথ নামায না পড়ে ও যাকাত না দেয়, তাহলে তারা তোমাদের দ্বীনী ভাই নয়।"

৩নং নীতি

বিশেষভাবে উল্লিখিত শব্দের সাথে বিধান বিশিষ্ট বা সীমিত নয়, এ মর্মে অন্য দলীল থাকলে বিপরীতধর্মী ভাবার্থ দলীল হবে না।

যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন,

[وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا] {النحل:١٤}

"তিনিই সমুদ্রকে অধীন করেছেন; যাতে তোমরা তা হতে তাজা মাংস (মাছ)

আহার করতে পার।” (নাহ্‌ল ঃ ১৪)

এখানে ‘তাজা’ শব্দ উল্লেখ থাকার ফলে উদ্দেশ্য এই নয় যে, অতাজা বা বাসী মাছ আহার করা যাবে না। যেহেতু ভিন্ন দলীল আছে যে, মৃত মাছ খাওয়া যাবে।

শরয়ী বিধানসমূহের পাঁচটি মান

শরীয়তের পক্ষ থেকে বান্দার প্রতি করণীয়-বর্জনীয় বিধান পালনের যে নির্দেশ থাকে তা পালনের আবশ্যকতা বা অনাবশ্যকতার ব্যাপারে ৫টি মান রয়েছে।

(১) ফরয বা ওয়াজেব ঃ যা পালন করা জরুরী বা আবশ্যক, না করলে মহাপাপ হয়।

(২) সুন্নত বা মুস্তাহাব ঃ যা পালন করা উচিত, উত্তম বা ভালো, করলে সওয়াব হয় এবং না করলে গোনাহ হয় না।

(৩) মুবাহ, জায়েয বা বৈধ ঃ যা করা বা না করায় কোন পাপ-পুণ্য নেই।

(৪) মকরূহ বা অপছন্দনীয় ঃ যা করা অনুচিত, ঘৃণ্য বা অপছন্দনীয়, না করলে সওয়াব হয় এবং করলে গোনাহ হয় না।

(৫) হারাম, নাজায়েয বা অবৈধ ঃ যা না করা জরুরী বা আবশ্যক, করলে মহাপাপ হয়।

উক্ত পাঁচটি শরয়ী বিধানের মান নিয়ে বিস্তারিত মৌলনীতি নিম্নরূপ ঃ-

ওয়াজেব

১নং নীতি

ওয়াজেব ও ফরযের মাঝে মানগত কোন পার্থক্য নেই।

অনেকে বলে থাকেন, সন্দিগ্ধ দলীল (যেমন খবরে ওয়াহিদ বা একক বর্ণনাকারীর হাদীস) দ্বারা প্রমাণিত বিষয়কে ওয়াজেব এবং অকাট্য দলীল (যেমন কুরআন ও মুতাওয়াতির হাদীস) দ্বারা প্রমাণিত বিষয়কে ফরয বলা হয়।

সলফদের নিকট এমন পার্থক্য ছিল না। যেহেতু তাঁদের নিকট দলীল গ্রহণে

খবরে ওয়াহিদ ও মুতাওয়াতিরের মাঝে কোন পার্থক্য ছিল না।

২নং নীতি

যে ওয়াজেবের সময় নির্ধারিত নয়, তা সত্বর সম্পাদন করা ওয়াজেব।

যেহেতু কেউ জানে না যে, পরবর্তী সময়ে তার কী ঘটবে?

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُم}[آل عمران : ١٣٣]

তোমরা প্রতিযোগিতা (ত্বরা) কর, তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে ক্ষমার জন্য---। (আলে ইমরান ঃ ১৩৩)

৩নং নীতি

যে ওয়াজেব পুরোটা পালন করার সামর্থ্য নেই, সে ওয়াজেব যথাসাধ্য যতটা পারা যায়, ততটাই পালন করতে হবে।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

[فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا] {التغابن:١٦}

"তোমরা আল্লাহকে যথাসাধ্য ভয় কর এবং শোনো, আনুগত্য কর।" (তাগাবুন ঃ ১৬)

আর মহানবী ﷺ বলেছেন,

((دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ ، إِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَثْرَةُ سُؤَالِهِمْ واخْتِلافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ ، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ)).

"আমি যে ব্যাপারে তোমাদেরকে (বর্ণনা না দিয়ে) ছেড়ে দিয়েছি, সে ব্যাপারে তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও (অর্থাৎ, সে ব্যাপারে আমাকে প্রশ্ন করো না)। কারণ, তোমাদের পূর্ববর্তীরা তাদের অধিক প্রশ্ন করার এবং তাদের নবীদের সঙ্গে মতভেদ করার ফলে ধ্বংস হয়ে গেছে। সুতরাং আমি যখন তোমাদেরকে কোন জিনিস থেকে নিষেধ করব, তখন তোমরা তা হতে দূরে থাকবে। আর যখন আমি তোমাদেরকে কোন কাজের আদেশ দেব, তখন তোমরা তা সাধ্যমতো পালন করবে।" *(বুখারী ৭২৮৮, মুসলিম ৩৩২ ১নং)*

৪নং নীতি

যে কাজ না করলে ওয়াজেব আদায় হয় না, সে কাজ করা ওয়াজেব।

যদিও সে কাজ করা মূলতঃ ওয়াজেব নয়।

আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ বলেন, 'মক্কা বিজয়ের বছরে নবী ﷺ যখন মার্রুয যাহরানের নিকট পৌঁছলেন, তখন তিনি আমাদেরকে শত্রু-সাক্ষাতের ব্যাপারে অবহিত করলেন এবং আমাদেরকে রোযা ভেঙ্গে ফেলতে আদেশ করলেন। সুতরাং আমরা সকলে রোযা ভেঙ্গে ফেললাম।' (তিরমিযী ১৬৮৪নং)

মুসাফিরের জন্য রোযা না রেখে কাযা করা মুবাহ। কিন্তু ওয়াজেব জিহাদ রোযা ভেঙ্গে শক্তিবর্ধন করা ছাড়া পরিপূর্ণ হবে না। তাই তিনি সাহাবাগণকে রোযা ভেঙ্গে ফেলতে আদেশ করলেন। আর সে ক্ষেত্রে রোযা ভেঙ্গে ফেলা ছিল ওয়াজেব। যেহেতু তা ছাড়া জিহাদের ওয়াজেব আদায় সম্ভব নয়।

এই নীতির ক্ষেত্রে শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ বলেছেন, 'আরবী ভাষা দ্বীনের অংশ। তা জানা ওয়াজেব ফরয। যেহেতু কিতাব ও সুন্নাহ বুঝা ফরয। আরবী ভাষা বুঝা ছাড়া দ্বীন বুঝা যায় না। আর যে কাজ করা ছাড়া ওয়াজেব পালন সম্ভব হয় না, সে কাজ করা ওয়াজেব। অতঃপর তার মধ্যে কিছু আছে ব্যক্তিগতভাবে সকলের উপর ওয়াজেব। আর কিছু আছে, যা কিছু লোকে সে ওয়াজেব পালন করলে, তা যথেষ্ট।' *(ইক্বতিয়াউস স্বিরাত্বিল মুস্তাক্বীম ২০৭পৃঃ)*

৫নং নীতি

যে আমল শর্তসাপেক্ষে ওয়াজেব, তার জন্য শর্ত অর্জন করা ওয়াজেব নয়।

যেমন হজ্জ শর্তসাপেক্ষে ওয়াজেব। মক্কা পর্যন্ত পৌঁছনোর ক্ষমতা; আর্থিক ও শারীরিক। আর মহিলার জন্য স্বামী বা মাহরাম থাকা শর্ত। যাদের শর্ত পূরণ হয়েছে, তাদের জন্য হজ্জ ফরয। যাদের পূরণ হয়নি, তাদের জন্য সেই শর্ত অর্জন করা ওয়াজেব নয়। অর্থ সঞ্চয় করা বা মহিলার বিবাহ করা ইত্যাদি।

অনুরূপ যাকাতের ক্ষেত্রেও। নিসাবের মালিক হতে চাওয়া ওয়াজেব নয়। *(মাজমূউ ফাতাওয়া, ইবনে তাইমিয়্যাহ ২০/১৬০)*

৬নং নীতি

যে ওয়াজেবের সীমা শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত নয়, তা ততটুকু পালন করা ওয়াজেব, যতটুকু পালন করার পর মনের প্রবল ধারণা জন্মে যে, সে তার প্রতি প্রদত্ত ওয়াজেব আদায় করেছে।

সীমা নির্ধারণের ব্যাপারে ওয়াজেব দুই প্রকার।

এক ঃ যার নির্ধারিত সীমা আছে। শরীয়ত যার নির্দিষ্ট কাল বা পরিমাণ নির্ধারণ

করেছে।

যেমন নামাযের জন্য নির্ধারিত সময়, উযূর জন্য নির্ধারিত অঙ্গ, যাকাতের পরিমাণ ইত্যাদি। সুতরাং এ ক্ষেত্রে ওয়াজেব হল, সেই নির্ধারিত সীমা লংঘন না করা।

দুই ঃ যার নির্ধারিত সীমা নেই। শরীয়ত যার নির্দিষ্ট কাল বা পরিমাণ নির্ধারণ করেনি।

এ ক্ষেত্রে চিন্তা-ভাবনা ও বিবেচনা ক'রে কাজ করতে হবে, যা করলে মনে প্রবল ধারণা জন্মে যে, সে সত্যই তার প্রতি প্রদত্ত ওয়াজেব পালন করেছে।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وأَطْعَمُوا القَانِعَ والمُعْتَرَّ } [الحج : ٣٦]

"(যখন কুরবানীর পশু) কাত হয়ে পড়ে যায়, তখন তোমরা তা হতে আহার কর এবং আহার করাও ধৈর্যশীল অভাবগ্রস্তকে ও যাচ্ঞাকারী অভাবগ্রস্তকে।" (হাজ্জ ঃ ৩৬)

{ وأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ } [البقرة :١٩٥]

"তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় কর।" (বাক্বারাহ ঃ ১৯৫)

উক্ত উভয় ক্ষেত্রে আহার করানো ও ব্যয় করার পরিমাণ নির্ধারিত করা হয়নি। এ ক্ষেত্রে বিবেচনা ক'রে তা করা ওয়াজেব। ক্ষুধার্তের ক্ষুধা দূর না হওয়া পর্যন্ত ওয়াজেব আদায় হবে না। অনুরূপ প্রয়োজন দূর না হওয়া পর্যন্ত ব্যয় করার ওয়াজেব আদায় হবে না।

৭নং নীতি

যে একাধিক অনির্দিষ্ট ওয়াজেবের মাঝে এখতিয়ার আছে, তার মধ্যে যে কোনও একটি পালন করলে ওয়াজেব আদায় হয়ে যাবে। আর সে ক্ষেত্রে একাধিক ওয়াজেব আদায় করা বিধেয় নয়।

যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন,

{ لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُم ولَكِنْ يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَان فكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطعِمونَ أَهْليكُمْ أَوْ كِسْوتُهُمْ أو تَحْرِيرُ رَقبةٍ فمَنْ لم يَجِدْ فصِيامُ ثَلاثةِ أيَّامٍ ذلكَ كفَّارةُ أيمانِكُم إِذَا حَلفْتُم } [المائدة : ٨٩]

"আল্লাহ তোমাদেরকে দায়ী করবেন না তোমাদের নিরর্থক শপথের জন্য,

কিন্তু যে সব শপথ তোমরা ইচ্ছাকৃতভাবে কর, সেই সকলের জন্য তিনি তোমাদেরকে দায়ী করবেন। অতঃপর এর কাফ্ফারা (প্রায়শ্চিত্ত) হল, দশজন দরিদ্রকে মধ্যম ধরনের খাদ্য দান করা; যা তোমরা তোমাদের পরিজনদেরকে খেতে দাও, অথবা তাদেরকে বস্ত্র দান করা, কিংবা একটি দাস মুক্ত করা। কিন্তু যার (এ সবে) সামর্থ্য নেই, তার জন্য তিন দিন রোযা পালন করা। তোমরা শপথ করলে এটিই হল তোমাদের শপথের প্রায়শ্চিত্ত।" (মায়িদাহ ঃ ৮৯)

'অথবা' শব্দ এখতিয়ার থাকা বোঝায়। সুতরাং কসমের কাফ্ফারায় খাদ্যদান, বস্ত্রদান এবং দাস স্বাধীন করা, এ তিনের মাঝে এখতিয়ার আছে। যে কোন একটি করলে ওয়াজেব আদায় হয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রে ৩টাই করা অথবা ২টা করা বিদআত হবে।

পরন্তু উক্ত ৩টির মধ্যে একটাও করতে সক্ষম না হলে ৩ দিন রোযা রাখতে হবে।

৮নং নীতি

ওয়াজেবুল কিফায়াহ কিছু লোক পালন করলে, বাকী লোকেরা অপরাধী হবে না। আর কেউ পালন না করলে সকলেই অপরাধী হবে।

ওয়াজেব বা ফরয দুই শ্রেণীর হয়ে থাকে ঃ-

এক ঃ ফরযে আইন। (ব্যক্তিগতভাবে তা সকলের উপর ফরয।)

যেমন পাঁচ ওয়াক্তের নামায, যাকাত, রমযানের রোযা ইত্যাদি।

দুই ঃ ফরযে কিফায়াহ। (কিছু লোক তা পালন করলে, বাকী লোকের জন্য যথেষ্ট। আর কেউ পালন না করলে সকলেই অপরাধী।)

যেমন জানাযার নামায ও দাফনকার্য, বিদআতীদের খন্ডন, দ্বীনের ফকীহ হওয়া ইত্যাদি।

এ ক্ষেত্রে কতিপয় বিষয় প্রণিধানযোগ্য ঃ-

১। কিছু সংখ্যক লোক ওয়াজেব পালন করতে গিয়ে যদি, তা আদায় না হয়, তাহলে তা ক্ষমার্হ হবে না।

২। ভারপ্রাপ্ত নয় এমন কোন ব্যক্তি পালন করলেও ওয়াজেবুল কিফায়াহ আদায় হয়ে যাবে।

৩। ওয়াজেবুল কিফায়াহ কেবল দ্বীন-বিষয়ক নয়, দুনিয়া-বিষয়কও হতে পারে।

৪। ওয়াজেবুল কিফায়াহ এমন নয় যে, তা শুরু করার পর বন্ধ করা যাবে না। অবশ্য পৃথক দলীল থাকলে আলাদা কথা। যেমন জিহাদের কাতারে দাঁড়িয়ে গেলে জিহাদ করা ওয়াজেব।

৯নং নীতি

দুটি ওয়াজেব পরস্পরবিরোধী হলে, যেটা বেশি তাকীদপ্রাপ্ত সেটাকে প্রাধান্য দিতে হবে বা আগে পালন করতে হবে।

১০নং নীতি

যে শব্দ দ্বারা কোন কিছু করাকে ফরয, ওয়াজেব, জরুরী, আবশ্যক বা অনিবার্য ইত্যাদি বুঝায়, তা হতে ওয়াজেব বা ফরয বিধান গ্রহণ করা হয়।

যে সকল কাজ না করলে নিন্দা আছে, শাস্তি বা হুমকি আছে অথবা আমল পন্ড হওয়ার ভীতিপ্রদর্শন আছে, সে সব কাজ ফরয বা ওয়াজেব বলে চিহ্নিত।

মুস্তাহাব, মানদূব বা সুন্নত

১নং নীতি

কোন্টা ওয়াজেব, কোন্টা সুন্নত, তা জানা ওয়াজেব আলাল কিফায়াহ।

অর্থাৎ, কিছু লোক জানলে বাকী লোক অপরাধী হয় না। অনুরূপভাবে পঞ্চবিধানের বাকিগুলির ক্ষেত্রেও বলা যায়।

২নং নীতি

মুস্তাহাব বা সুন্নত আমল শুরু করলে তা শেষ করা ওয়াজেব হয়ে যায় না।

যেহেতু যা শুরু করা ওয়াজেব নয়, তা শেষ করা ওয়াজেব হয় না।

যেমন সুন্নত নামায বা রোযা শুরু করলে এবং কোন কারণে তা ভাঙ্গতে হলে গোনাহ হয় না।

অবশ্য এ ক্ষেত্রে হজ্জ-উমরাহর বিষয়টা স্বতন্ত্র। কেননা মহান আল্লাহর স্পষ্ট নির্দেশ,

{ وأتِمُّوا الحَجَّ والعمْرَةَ للهِ } [البقرة : ١٩٦]

“আর আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ্জ ও উমরাহ পূর্ণভাবে সম্পাদন কর।” (বাক্বারাহঃ ১৯৬)

কিন্তু মহান আল্লাহ বলেছেন,

{ ولاتَبطِلُوا أعْمَالَكُم } [محمد : ٣٣]

"তোমরা তোমাদের আমলসমূহ বাতিল করো না।" (মুহাম্মাদ ঃ ৩৩)

তাঁর এই আম নির্দেশ থেকে বুঝা যায় যে, কোন আমলই বাতিল বা নষ্ট করা যাবে না।

তবে অধিকাংশ উলামাগণ এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, 'রিয়া (লোকপ্রদর্শন) দ্বারা তোমরা তোমাদের আমল বরবাদ করো না। বরং তা বিশুদ্ধভাবে আল্লাহর জন্য কর।' এ কথা বলেছেন আহলে সুন্নাহর আলেমগণ।

অনেকে বলেছেন, 'কাবীরা গোনাহ দ্বারা তোমরা তোমাদের আমল বরবাদ করো না।' এ মতটি হল মু'তাযিলা ফির্কার।

বলা বাহুল্য, আমল শুরু ক'রে তা বাতিল করো না অথবা তা পূর্ণরূপে সম্পাদন ও সম্পন্ন করো, এমন ব্যাখ্যা এখানে সঠিক নয়।

৩নং নীতি

কোন সুন্নত পালন করতে গিয়ে যদি ফিতনার সৃষ্টি হয়, তাহলে তা সাময়িকভাবে বর্জন করতে হবে; যতক্ষণ না অজ্ঞ মানুষকে সে বিষয়ে সচেতন ও উৎসাহিত ক'রে আমলের ময়দান তৈরি করা হয়েছে।

যেমন মহানবী ﷺ ফিতনার আশঙ্কায় কা'বাগৃহ পুনর্নির্মাণের মতো মহৎ কাজ বর্জন করেছিলেন। (মাজমূউ ফাতাওয়া, ইবনে তাইমিয়্যাহ ২২/৪০৭)

সুন্নাহর পালন ও প্রচার ফিতনা নয়। আসলে সুন্নাহ সম্পর্কে সমাজের অজ্ঞতাই হল ফিতনা। সুতরাং উলামার উচিত, হিকমতের সাথে সেই অজ্ঞতা দূরীভূত ক'রে সুন্নাহ প্রতিষ্ঠা করা।

অনুরূপ সুন্নত পালনের তাকীদে ওয়াজেব ত্যাগ করা যাবে না। সশব্দে 'আমীন' বলা সুন্নত হলেও জামাআতে নামায আদায় করা ওয়াজেব। সুতরাং সতর্ক হন।

৪নং নীতি

কোন সুন্নত কাজ যদি বিদআতীদের প্রতীকরূপ ধারণ করে, তাহলেও তা বর্জন করা যাবে না।

উদাহরণ স্বরূপ পায়ের অর্ধেক নলা পর্যন্ত লুঙ্গি তুলে পরাটা বিদআতীদের অভ্যাস হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে তা বর্জন করা যাবে না। যেহেতু তা সুন্নত। এ

ক্ষেত্রে বিদআতীর সাদৃশ্য উদ্দিষ্ট নয়, বরং রসূল ﷺ-এর সাদৃশ্য উদ্দিষ্ট হবে।

একই কারণে, ইয়াহুদী-খ্রিস্টান বা মুশরিকরা দাড়ি রাখলে, তাদের বৈপরীত্য করতে মুসলিম দাড়ি চাঁছতে পারে না। সুতরাং সাবধান।

মুবাহ

যা করলেও সওয়াব বা গোনাহ নেই, ছাড়লেও সওয়াব বা গোনাহ নেই।

১নং নীতি

ব্যবহারিক বিষয়-বস্তুসমূহের মৌলিক বিধান হল, তা মুবাহ।

হারাম বলতে হলে, তার দলীল চাই। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ} [الأنعام:١١٩]

"যা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ, তা তিনি বিশদভাবেই তোমাদের নিকট বিবৃত করেছেন।" (আন্‌আম ঃ ১১৯)

নিষিদ্ধ ও হারাম বস্তু তিনি বিবৃত করেছেন, অর্থাৎ তিনি বিশদভাবে বর্ণনা দিয়েছেন। সুতরাং বিশদে যার হারাম হওয়ার কথা আসেনি, তা হারাম নয়। আর যা হারাম নয়, তা হালাল। *(মাজমূউ ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়্যাহ ২১/৫৩৬)*

মহানবী ﷺ বলেছেন,

« الْحَلاَلُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِى الْقُرْآنِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِى الْقُرْآنِ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَقَدْ عَفَا عَنْهُ ».

"হালাল তাই, যা আল্লাহ কুরআনে হালাল করেছেন এবং হারাম তাই, যা আল্লাহ কুরআনে হারাম করেছেন। আর যে বিষয়ে নীরব থেকেছেন, সে বিষয় ক্ষমার্হ করেছেন।" *(তিরমিযী ১৭২৬, ইবনে মাজাহ ৩৩৬৭নং)*

অর্থাৎ, যে বিষয়-বস্তুকে তিনি 'হারাম' বলে ঘোষণা করেননি, তা হল হালাল। তা গ্রহণ করলে ক্ষমার্হ হবে, তাতে কোন শাস্তি হবে না।

শরীয়তের কিছু পরিভাষা আছে, যার মাধ্যমে মুবাহ বা হালাল হওয়ার বিষয়টি পরিষ্কার হয়। যেমন ঃ-

কোন বিষয়ে অনুমতি বা অনুমোদন দেওয়া।

কোন বিষয়ে এখতিয়ার দেওয়া।

নিষেধের পর আদেশ দেওয়া।

পাপ, সমস্যা বা ক্ষতির আরোপ তুলে নেওয়া।
ক্ষমার কথা উল্লিখিত হওয়া।
ওয়াহীর যুগে মৌনসম্মতি থাকা।
কেউ কোন বিষয়ে হারাম করলে, তাতে প্রতিবাদ বা আপত্তি করা।
উল্লেখ থাকা যে, তা আমাদের জন্য সৃষ্টি হয়েছে।
তা দিয়ে আমাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করা।
তা পূর্ববর্তী উম্মতের আচরণ বলে উল্লেখ করা এবং তার নিন্দা না করা। ইত্যাদি। (বাদাইয়ুল ফাওয়ায়িদ ২/২ ১৮)

২নং নীতি

মুবাহ বারংবার করতে থাকলেও তার ফলে গোনাহগার হতে হয় না।

হ্যাঁ, তার ফলে যদি কোন ওয়াজেব ত্যাগ হয় অথবা হারাম করতে হয়, তাহলে তা হারাম হয়ে যায়। যেহেতু যে মুবাহ হারামে পৌঁছে দেয়, তা করা হারাম।

৩নং নীতি

মুবাহ কাজ করেও সওয়াবের অধিকারী হওয়া যায়; যদি তাতে নেক নিয়ত থাকে।

যেমন কেউ দিনে কিছু কাল এই নিয়তে ঘুমায় যে, সে তাহাজ্জুদে জাগতে পারবে। এই শ্রেণীর উক্তি হল আবুদ দার্দা ﵁-এর, তিনি বলেছেন,

(أَحْتَسِبُ نَوْمَتِي كَمَا أَحْتَسِبُ قَوْمَتِي.

'আমি আমার ঘুমের মাঝে সওয়াব কামনা করি, যেমন কিয়ামের মাঝে করি।' *(বুখারী ৪৩৪২, মুসলিম ৪৮২২নং)*

বলাই বাহুল্য যে, পানাহার, নিদ্রা, অর্থোপার্জন ইত্যাদি বিষয় মুবাহ হলেও, তাতে যদি কোন ইবাদত বা আনুগত্যে শক্তি-অর্জন উদ্দেশ্য হয়, তাহলে সেসব মুবাহ কাজও ইবাদতে পরিণত হয়। *(গামযু উয়ূনিল বাস্বায়ির ৩৪৮পৃঃ)*

মকরূহ

প্রথমতঃ ফিকহী পরিভাষায় মকরূহ

মকরূহ হল প্রত্যেক সেই নিষিদ্ধ জিনিস, যাকে শরীয়ত কঠোর বা চূড়ান্তভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেনি।

মকরূহ হল মুবাহ ও হারামের মাঝামাঝি মানের বিধান। যা করলে গোনাহ হয় না এবং না করলে সওয়াব পাওয়া যায়।

এমন কাজ করতে নিষেধ আসে, কিন্তু অন্য দলীল দ্বারা বোঝা যায় যে, সে নিষেধ থেকে উদ্দিষ্ট 'হারাম' পর্যায়ের নিষেধ নয়।

যেমন উম্মে আত্বিয়্যাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, 'আমাদেরকে জানাযার সাথে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু (এ ব্যাপারে) আমাদের উপর জোর দেওয়া হয়নি।' *(বুখারী ১২৭৮, মুসলিম ২২০৯-২২১০নং)*

অর্থাৎ, যেমন অন্যান্য হারাম কাজ কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে, তেমন কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়নি।

তার মানে হল, আমাদের জন্য জানাযায় অংশগ্রহণ করা মকরূহ করা হয়েছে, হারাম করা হয়নি।

দ্বিতীয়তঃ শরীয়তের পরিভাষায় মকরূহ

শরীয়তের পরিভাষায় মকরূহ অর্থ ঘৃণ্য ও হারাম। যেমন শির্ক করা, পিতামাতার অবাধ্য হওয়া, অপব্যয় করা, কার্পণ্য করা, একেবারে মুক্তহস্ত হওয়া, সন্তান হত্যা করা, ব্যভিচার করা, মানুষ খুন করা, এতীমের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করা, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা, মেপে দেয়ার সময় পূর্ণরূপে না মাপা এবং সঠিক দাঁড়ি-পাল্লায় ওজন না করা, যে বিষয়ে কোন জ্ঞান নেই, সেই বিষয়ে অনুমান দ্বারা পরিচালিত হওয়া এবং ভূ-পৃষ্ঠে দম্ভভরে বিচরণ করার মতো বড় বড় অপরাধ নিষেধ করার পর মহান আল্লাহ বলেছেন,

[كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا] {الإسراء:٣٨}

"এ সবের মধ্যে যেগুলি মন্দ, সেগুলি তোমার প্রতিপালকের নিকট ঘৃণ্য (মকরূহ)।" (বানী ইস্রাঈল ঃ ৩৮)

সলফগণও হারাম অর্থে 'মকরূহ' শব্দ প্রয়োগ করতেন। সুতরাং তাঁরা 'এটা হারাম' না বলে 'এটা মকরূহ' বলতেন। (ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন ১/৩৫)

হারাম

১নং নীতি

সকল হারাম এক পর্যায়ের নয়।

কোন কোন হারাম বিষয় অন্য হারাম থেকে অপেক্ষাকৃত বেশি বড়। যেমন সূদ খাওয়া ও খুন করা। অবশ্যই খুন করা বেশি মাপের হারাম। আর এ পার্থক্য হারামের ক্ষতিকারিতা ও শাস্তি দেখে নির্ধারণ করা যায়।

২নং নীতি

কোন জিনিস হারাম হলে, তার সকল অংশই হারাম।

যেমন শূকর, কুকুর, মৃত পশুর সকল অংশই হারাম।

অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী বয়ান পাওয়া গেলে সে কথা আলাদা। যেমন পুরুষদের জন্য স্বর্ণ ও রেশম ব্যবহার করার বিষয়। প্রক্রিয়াজাত ক'রে চর্মের ব্যবহার ইত্যাদি।

৩নং নীতি

হারামের অসীলাও হারাম। যে হালাল কাজ হারাম কাজে পৌঁছে দেয়, তা হারাম। যে হালাল কাজের কারণে কোন হারাম সৃষ্টি হয়, তা করা হারাম।

তাহাজ্জুদ পড়তে গিয়ে যদি কারো ফজর ছুটে যায়, তাহলে তার জন্য তাহাজ্জুদ পড়া জায়েয নয়।

যদি কাউকে একাকী ছাড়লে হারাম ঘটবে ধারণা হয়, তাহলে তাকে একাকী ছাড়া বৈধ নয়।

পাপ করা যেমন হারাম, তেমনি তার ছিদ্রপথ বা মাধ্যম বন্ধ করা ওয়াজেব।

৪নং নীতি

হারামের নিয়ত পাকা হলে, তাতেও পাপ হবে, যদিও তা কাজে পরিণত না করে।

হারাম কাজের নিয়ত করার পর তা আল্লাহর ভয়ে ত্যাগ করলে সওয়াব হয়। কিন্তু তাতে দৃঢ়সংকল্প হওয়ার পর কোন কারণে সম্পাদন না করতে পারলেও পাপী হতে হয়।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

((إِنَّمَا الدُّنْيَا لأَرْبَعَةِ نَفَرٍ : عَبْدٍ رَزَقَهُ اللهُ مَالاً وَعِلماً ، فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ ، وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ، وَيَعْلَمُ للهِ فِيهِ حَقًّا ، فَهَذَا بِأَفضَلِ المَنَازِلِ . وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللهُ عِلْماً، وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالاً ،

فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ ، يَقُولُ : لَوْ أَنَّ لِي مَالاً لَعَمِلتُ بِعَمَلِ فُلانٍ ، فَهُوَ بنيَّتِهِ ، فأجْرُهُمَا سَوَاءٌ . وَعَبْدٍ رَزَقَهُ الله مَالاً ، وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْماً ، فَهُوَ يَخبطُ في مَالِهِ بغَيرِ عِلْمٍ ، لاَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ ، وَلاَ يَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ ، وَلاَ يَعْلَمُ للهِ فِيهِ حَقّاً ، فَهذَا بِأَخْبَثِ المَنَازِلِ . وَعَبْدٍ لَمْ يَرْزُقْهُ اللهُ مَالاً وَلاَ عِلْماً ، فَهُوَ يَقُولُ : لَوْ أَنَّ لِي مَالاً لَعَمِلْتُ فِيهِ بعَمَلِ فُلاَنٍ ، فَهُوَ بنِيَّتِهِ ، فَوِزْرُهُمَا سَوَاءٌ)).

"দুনিয়ায় চার প্রকার লোক আছে;

(১) ঐ বান্দা, যাকে আল্লাহ ধন ও (ইসলামী) জ্ঞান দান করেছেন। অতঃপর সে তাতে আল্লাহকে ভয় করে এবং তার মাধ্যমে নিজ আত্মীয়তা বজায় রাখে। আর তাতে যে আল্লাহর হক রয়েছে তা সে জানে। অতএব সে (আল্লাহর কাছে) সবচেয়ে উৎকৃষ্ট স্তরে অবস্থান করবে।

(২) ঐ বান্দা, যাকে আল্লাহ (ইসলামী) জ্ঞান দান করেছেন; কিন্তু মাল দান করেননি। সে নিয়তে সত্যনিষ্ঠ, সে বলে যদি আমার মাল থাকত, তাহলে আমি (পূর্বোক্ত) অমুকের মত কাজ করতাম। সুতরাং সে নিয়ত অনুসারে বিনিময় পাবে; এদের উভয়ের প্রতিদান সমান।

(৩) ঐ বান্দা, যাকে আল্লাহ মাল দান করেছেন; কিন্তু (ইসলামী) জ্ঞান দান করেননি। সুতরাং সে না জেনে অবৈধরূপে নির্বিচারে মাল খরচ করে; সে তাতে আল্লাহকে ভয় করে না, তার মাধ্যমে নিজ আত্মীয়তা বজায় রাখে না এবং তাতে যে আল্লাহর হক রয়েছে তাও সে জানে না। অতএব সে (আল্লাহর কাছে) সবচেয়ে নিকৃষ্ট স্তরে অবস্থান করবে। আর

(৪) ঐ বান্দা, যাকে আল্লাহ ধন ও (ইসলামী) জ্ঞান কিছুই দান করেননি। কিন্তু সে বলে, যদি আমার নিকট মাল থাকত, তাহলে আমিও (পূর্বোক্ত) অমুকের মত কাজ করতাম। সুতরাং সে নিয়ত অনুসারে বিনিময় পাবে; এদের উভয়ের পাপ সমান।" *(তিরমিযী ২৩২৫নং)*

আবূ বাক্‌রাহ যাক্বাফী ﷺ বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

((إِذَا التَقَى المسلِمَان بسَيْفَيهِمَا فالقَاتِلُ وَالمَقْتُولُ في النّارِ))

"যখন দু'জন মুসলমান তরবারি নিয়ে আপোসে লড়াই করে, তখন হত্যাকারী ও নিহত দু'জনই দোযখে যাবে।"

আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! হত্যাকারীর দোযখে যাওয়া তো স্পষ্ট;

কিন্তু নিহত ব্যক্তির ব্যাপার কী?' তিনি বললেন,

((إِنَّهُ كَانَ حَرِيصاً عَلَى قَتلِ صَاحِبِهِ)).

"সেও তার সঙ্গীকে হত্যা করার জন্য লালায়িত ছিল।" *(বুখারী ৩১, ৬৮৭৫, মুসলিম ৭৪৩৪নং)*

৫নং নীতি

দৃঢ়ভাবে কোন কাজ ত্যাগ করতে বলার মানে, সে কাজ হারাম।

এ ছাড়া 'এটা করো না, এটা নিষিদ্ধ, এটা করা মানা, এটা হারাম' ইত্যাদি হারাম হওয়ার দলীল।

কোন কাজ করলে শাস্তির হুমকি, কর্তার নিন্দা, কর্তার জন্য দন্ডবিধি বা কাফ্ফারার বিধান থাকলে, সে কাজ করাও হারাম।

'এটা সঙ্গত নয়, এটা বৈধ নয়, এটা ঠিক নয়' ইত্যাদি শব্দেও হারাম চিহ্নিত হয়।

'এ কাজ করা ভ্রষ্টতা, এটা শয়তানের কাজ বা চক্রান্ত, এটা আল্লাহ পছন্দ করেন না, তিনি এ কাজের কাজীকে কিয়ামতে পবিত্র করবেন না, তার সাথে কথা বলবেন না, তার দিকে তাকিয়ে দেখবেন না' ইত্যাদি শব্দের মাধ্যমে হারাম নির্ধারিত হয়ে থাকে। (বাদাইয়ুল ফাওয়াইদ ২/২ ১৮)

মুসলিম নর-নারীর ক্ষেত্রে কতিপয় মৌলনীতি

১নং নীতি

মুসলিম শরয়ী ভারপ্রাপ্ত হয় সাবালক-সাবালিকা হলে।

সাবালক হওয়ার চিহ্ন হল ঃ-

(১) স্বপ্নদোষ শুরু হওয়া।

(২) লজ্জাস্থানের লোম পুরু হয়ে গজিয়ে ওঠা।

(৩) অথবা ১৫ বছর বয়স হওয়া।

সাবালিকা হওয়ার চিহ্ন হল ঃ-

(১) স্বপ্নদোষ শুরু হওয়া।

(২) লজ্জাস্থানের লোম পুরু হয়ে গজিয়ে ওঠা।

(৩) মাসিক শুরু হওয়া।

(৪) অথবা ১৫ বছর বয়স হওয়া।

২নং নীতি

ভারপ্রাপ্ত গণ্য হবে দুটি শর্তে ঃ সজ্ঞানতা ও সক্ষমতা।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{ لايُكَلِّفُ الله نَفْسًا إلا وُسْعهَا } [البقرة : ٢٨٦]

"আল্লাহ কাউকেও তার সাধ্যের অতিরিক্ত দায়িত্ব অর্পণ করেন না।" (বাক্বারাহ ঃ ২৮৬)

{ ومَا كُنَّا مُعذِّبينَ حتَّى نبْعَثَ رَسُولاً } [الإسراء : ١٥]

"আমি রসূল না পাঠানো পর্যন্ত কাউকে শাস্তি দিই না।" (বানী ইস্রাঈল ঃ ১৫)

বলা বাহুল্য, ইল্‌ম ও আমলে সামর্থ্য না থাকলে মুসলিম শরয়ী ভারপ্রাপ্ত হয় না।

নামায দাঁড়িয়ে না পড়তে পারলে বসে, বসে না পারলে শুয়ে পড়া যাবে।

রোযা না রাখতে পারলে কাযা করা অথবা ফিদ্‌য়া দেওয়া যাবে।

সামর্থ্য না থাকলে হজ্জ ফরয হয় না।

৩নং নীতি

সাবালক ও জ্ঞানসম্পন্ন না হলে ভারপ্রাপ্ত গণ্য হবে না।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

« رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبَرَ ».

"তিন ব্যক্তির নিকট হতে (কিরামান কাতেবীনের পাপ-পুণ্য লিখার) কলম তুলে নেওয়া হয়েছে; ঘুমন্ত ব্যক্তি হতে যতক্ষণ না সে জাগ্রত হয়েছে, পাগল ব্যক্তি হতে যতক্ষণ না সে সুস্থ হয়েছে এবং শিশু হতে, যতদিন না সে সাবালক হয়েছে।" *(আহমাদ ১/১৪০, আবূ দাউদ ৪৪০০নং, হাকেম ৪/৪৩০)*

বলা বাহুল্য, নাবালক ও জ্ঞানশূন্য ব্যক্তি শরীয়তের ভারপ্রাপ্ত নয়। যেমন তারা যদি কোন অপরাধ করে, তাও ধর্তব্য নয়।

৪নং নীতি

যে শরয়ী ভারপ্রাপ্ত নয়, তার কথা ও কাজের উপর কোন বিধান নির্ভরশীল

হবে না।

যাদের সঠিক জ্ঞান নেই, তাদের কোন কথা বা কাজের উপর নির্ভর ক'রে বিধান দেওয়া যাবে না। সুতরাং নাবালক শিশু, জ্ঞানশূন্য বা পাগলের তালাক, কুফ্‌র, চুক্তি ইত্যাদি গণ্য নয়। মহান আল্লাহ নামায শুদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে বলেছেন, "হে মু'মিনগণ! তোমরা নেশার অবস্থায় নামাযের নিকটবর্তী হয়ো না, যতক্ষণ না তোমরা কী বলছ, তা বুঝতে পার।" (নিসা ঃ ৪৩)

তাছাড়া হৃদয় ও ইচ্ছার একটা প্রভাব আছে বিধানে। নিয়তের উপরে আমল নির্ভরশীল। অন্তরের সাথে সম্পর্কহারা অনিচ্ছাকৃত কর্ম ধর্তব্য নয়। এই জন্য মহান আল্লাহ কসমের বিধানে বলেছেন,

[لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ] {البقرة:٢٢٥}

"তোমাদের অর্থহীন শপথের জন্য আল্লাহ তোমাদেরকে দায়ী করবেন না। কিন্তু তিনি তোমাদের অন্তরের সংকল্পের জন্য দায়ী করবেন। আর আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, বড় সহিষ্ণু।" (বাক্বারাহ ঃ ২২৫)

অনুরূপভাবে ভুলে গিয়ে অথবা ভুল ক'রে অথবা নিরুপায় হয়ে কোন কর্ম করলে, তা ধর্তব্য নয়। যেহেতু সে কর্মেও মনের ইচ্ছার ও হৃদয়ের কোন সম্পর্ক থাকে না। আর মহানবী ﷺ বলেছেন,

((إِنَّ الله عزّ وجلّ وَضَعَ عَن أُمّتِي الخطأ ، والنِّسيان ، وما استُكرِهُوا عليهِ)).

"নিশ্চয় মহান আল্লাহ আমার উম্মতের ভুল, বিস্মৃতি এবং যার উপর তাকে নিরুপায় করা হয়, তার (পাপ)কে মার্জনা করেন।" *(ইবনে মাজাহ ২০৪৫নং, বাইহাকী, ত্বাবারানী, ইবনে হিব্বান)*

অবশ্য পৃথক কোন দলীল থাকলে সেই অনুসারে তাদের প্রতি অপরাধ আরোপ করা হবে।

৫নং নীতি

যে অপরাধ ধনমালের ক্ষতি বা প্রাণহানি সংক্রান্ত, তার ব্যাপারে কারো কোন ওজর গ্রহণযোগ্য হবে না।

যে কাজ করা বা যে কথা বলা নিষিদ্ধ, তার শাস্তির বিধান হৃদয়ের সাথে সম্পৃক্ত। স্বেচ্ছায় হলে তাতে অপরাধী হয়ে শাস্তিযোগ্য হবে, নচেৎ না।

কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি জ্ঞানশূন্য বা ঘুমন্ত অবস্থায়, ভুল ক'রে বা ভুলে গিয়ে প্রাণহানি ঘটায় বা মালের ক্ষতিসাধন ক'রে বসে, তাহলে তার দন্ড আছে। আর সেটা বান্দার অধিকারে ন্যায়পরায়ণতা বজায় রাখার পর্যায়ভুক্ত, শাস্তিবিধানের পর্যায়ভুক্ত নয়। (মাজমূউ ফাতাওয়া, ইবনে তাইমিয়্যাহ ১৪/ ১১৯)

ইজতিহাদ ও তাক্বলীদ

সরাসরি দলীল দেখে ও বুঝে বিধান গ্রহণ করার নাম ইজতিহাদ। যিনি তা করতে পারেন, তিনি হলেন মুজতাহিদ। আর যিনি তা পারেন না; বরং বিনা দলীলে অপরের অন্ধানুকরণ করেন, তিনি হলেন মুক্বাল্লিদ এবং তাঁর এই কর্মের নাম তাক্বলীদ। অবশ্য যিনি দলীল দেখে কারো অনুসরণ করেন, তাঁর কর্ম হল ইত্তিবা'।

এ মর্মেও রয়েছে একাধিক নীতি।

১নং নীতি

যাঁর কাছে দলীল পৌঁছেছে অথবা যিনি দলীল খুঁজতে সক্ষম, তাঁর জন্য বিধেয় নয়, দলীল উপেক্ষা ক'রে কোন বড় বা ছোট আলেমের অন্ধানুকরণ বা তাক্বলীদ করা।

মূলতঃ তাক্বলীদ বৈধ নয়। প্রত্যেক সক্ষম মুসলিমের উচিত দলীল অনুসন্ধান করা এবং কারো কথাকে সেইরূপ মেনে না নেওয়া, যেরূপ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথাকে মেনে নেওয়া হয়।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

((اتَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ))
(الأعراف : ٣)

"তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে, তোমরা তার অনুসরণ কর এবং তাঁকে ছাড়া অন্যদেরকে অভিভাবকরূপে অনুসরণ করো না। তোমরা খুব অল্পই উপদেশ গ্রহণ ক'রে থাক।" (আ'রাফ ঃ ৩)

((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً)) (النساء : ٥٩)

"হে বিশ্বাসিগণ! যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস কর, তাহলে তোমরা আল্লাহর অনুগত হও, রসূল ও তোমাদের নেতৃবর্গ (ও উলামা)দের অনুগত হও। আর যদি কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটে, তাহলে সে

বিষয়কে আল্লাহ ও রসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও। এটিই হল উত্তম এবং পরিণামে প্রকৃষ্টতর।" (নিসা ঃ ৫৯)

মহানবী ﷺ বলেছেন,

((تَرَكْتُ فِيكُمْ شَيْئَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُما كِتابَ الله وسُنَّتِي وَلَنْ يَتَفَرَّقا حَتَّى يَرِدا عَلَيَّ الحَوْضَ)).

"আমি তোমাদের মাঝে দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি, যা অবলম্বন করলে তোমরা কখনই পথভ্রষ্ট হবে না। তা হল আল্লাহর কিতাব এবং আমার সুন্নাহ। 'হওয' (কাওসারে) আমার নিকট অবতরণ না করা পর্যন্ত তা বিচ্ছিন্ন হবে না।" *(হাকেম ৩১৯নং)*

উক্ত হাদীসের মর্মার্থ হল এই যে, কিতাব ও সুন্নাহ ছেড়ে বিনা দলীলে কোন আলেমের অন্ধানুকরণ ভ্রষ্টতার দিকে ঠেলে দেবে।

আরো বড় সমস্য হল নির্দিষ্ট কোন আলেম বা ইমামের তাক্বলীদ করা এবং কুরআন-হাদীসের দলীলকে অবজ্ঞা করা! আর যারা তা করে, তাদের যুক্তিও বেশ।

ইবনে আব্দিল বার্র (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন,

যে ব্যক্তি তাক্বলীদের পক্ষপাতী, তাকে বলা হবে, 'তুমি তাক্বলীদ করার কথা বলে সলফদের বিরোধিতা কেন করছ? অথচ তাঁরা তো তাক্বলীদ করেননি।'

সে যদি বলে, 'যেহেতু আল্লাহর কিতাবের অর্থ ও ব্যাখ্যা সম্বন্ধে আমার জ্ঞান নেই এবং তাঁর রসূলের সুন্নাহ আমার আয়ত্তে নেই। আর আমি যাঁর তাক্বলীদ করছি, তিনি তা জানেন। সুতরাং আমি তাঁর তাক্বলীদ করছি, যিনি আমার থেকে বেশি জ্ঞানী।'

তাকে বলা হবে, 'আল্লাহর কিতাবের অর্থ ও ব্যাখ্যা, রসূল ﷺ-এর সুন্নাহ অথবা কোন বিষয়ে তাঁদের ঐকমত্য অবশ্যই হক, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তুমি যে বিষয়ে তাঁদের কাউকে ছেড়ে কাউকে মেনে তাক্বলীদ করছ, তাঁরা নিজেরাই সে বিষয়ে মতভেদ করেছেন। তাহলে তোমার কাউকে ছেড়ে কাউকে মেনে তাক্বলীদ যে করছ, তাতে তোমার দলীল বা যুক্তি কী? অথচ তাঁরা প্রত্যেকেই আলেম। আর সম্ভবতঃ তুমি যাঁর কথা বর্জন করছ, তিনি তাঁর চাইতে বেশি জ্ঞানী, যাঁর মযহাব তুমি অবলম্বন করেছ।'

সে যদি বলে, 'আমি তাঁর তাক্বলীদ করেছি, যেহেতু আমি জেনেছি, সেটাই

সঠিক।'

তাকে বলা হবে, 'তুমি কি কিতাব বা সুন্নাহ বা ইজমার কোন দলীল থেকে জেনেছ?'

সে যদি বলে, 'হ্যাঁ।' তাহলে সে তাক্বলীদ বাতিল করল। আর তার নিকট তার দাবীকৃত দলীল চাওয়া হবে।

কিন্তু যদি বলে, 'আমি তাঁর তাক্বলীদ করেছি, যেহেতু সে আমার চাইতে বেশি জ্ঞানী।'

তাকে বলা হবে, 'তাহলে তুমি তাঁদের প্রত্যেকের তাক্বলীদ কর, যাঁরা তোমার চাইতে বেশি জ্ঞানী। আর তুমি এ ব্যাপারে বহু উলামা পাবে। তুমি যাঁর তাক্বলীদ করেছ, তাঁকেই নির্দিষ্ট করো না। (কেবল একজনেরই তাক্বলীদ করো না।) যেহেতু তোমার যুক্তি হচ্ছে, তিনি তোমার চাইতে বেশি জ্ঞানী।' (জামেউ বায়ানিল ইল্ম ২/৯৯৪)

ইবনে আবিল ইয্য (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, 'তাওহীদ হল দুই প্রকার ঃ রসূল প্রেরকের তাওহীদ (একত্ববাদ) এবং রসূলের অনুসরণ করার তাওহীদ (একত্ববাদ)। এই দুই তাওহীদ ব্যতিরেকে আল্লাহর আযাব থেকে বান্দার কোন মুক্তি নেই। সুতরাং সে তারই কাছে বিচারপ্রার্থী হয় এবং তার বিচার ছাড়া অন্য বিচারে তুষ্ট হয় না।' (শারহুত ত্বাহাবিয়্যাহ ২১৭পৃঃ)

ইবনে তাইমিয়াহ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, 'কিতাব, সুন্নাহ ও ইজমাতে এ কথা প্রমাণিত যে, মহান আল্লাহ সৃষ্টির উপর তাঁর আনুগত্য এবং তাঁর রসূল ﷺ-এর আনুগত্য ফরয করেছেন। আর রসূল ﷺ ছাড়া আদেশ-নিষেধে অন্য কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তিত্বের আনুগত্য উম্মতের উপর ওয়াজেব করেননি। এ ব্যাপারেও সকলেই একমত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ব্যতীত অন্য কেউই তার আদেশ-নিষেধে ত্রুটিমুক্ত নয়। এই জন্য একাধিক উলামা বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ব্যতীত প্রত্যেক ব্যক্তির কথা গ্রহণীয় ও বর্জনীয়।' (মাজমূউ ফাতাওয়া ২০/২১০)

নির্দিষ্ট ইমামের তাক্বলীদের ব্যাপারে তিনি আরো বলেছেন, 'কিতাব ও সুন্নাহতে মুজতাহিদ ইমামগণের মধ্যে একজনের থেকে অন্যজনের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। সুতরাং মালেক, লাইষ বিন সা'দ, আওযায়ী, সওরী তাঁরা তাঁদের যুগে সকলেই ইমাম। তাঁদের প্রত্যেকের তাক্বলীদ অন্যের তাক্বলীদের মতোই। কোন মুসলিম বলে না যে, এঁকে বাদ দিয়ে এঁর তাক্বলীদ করা জায়েয।' (ঐ

২০/৫৮৪)

২নং নীতি

তার জন্য তাক্বলীদ বৈধ, যে ব্যক্তি কোনও ওযরে ইজতিহাদ করতে সক্ষম নয়। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{ فاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُم } [التغابن : ١٦]

তোমরা আল্লাহকে যথাসাধ্য ভয় কর এবং শোনো, আনুগত্য কর ও ব্যয় কর, তোমাদের নিজেদেরই কল্যাণ হবে। আর যারা অন্তরের কার্পণ্য হতে মুক্ত, তারাই সফলকাম। (তাগাবুন ঃ ১৬)

সুতরাং ওয়াজেব হল, তাক্বলীদ না করা। কিন্তু ওযর থাকলে তাক্বলীদ জায়েয। যেহেতু অক্ষমতার সাথে ওয়াজেব থাকে না। উম্মতের অধিকাংশের মত এই যে, মোটের উপর তাক্বলীদ বৈধ। তাঁরা প্রত্যেকের জন্য ইজতিহাদকে ওয়াজেব এবং তাক্বলীদকে হারাম মনে করেন না। যেমন তাঁরা প্রত্যেকের জন্য তাক্বলীদকে ওয়াজেব এবং ইজতিহাদকে হারাম মনে করেন না। ইজতিহাদ করতে সক্ষম ব্যক্তির জন্য ইজতিহাদ করা বৈধ এবং ইজতিহাদ করতে অক্ষম ব্যক্তির জন্য তাক্বলীদ করা বৈধ। (মাজমূউ ফাতাওয়া ২০/২০৪)

৩নং নীতি

যে মাসআলায় সলফগণের উক্তি আছে, তাঁদের সেই উক্তি থেকে বের হওয়া বিধেয় নয়।

তফসীর বা ফিকহে সলফদের উক্তি অগ্রগণ্য। তাঁদের উক্তি থাকতে মনগড়া কারো উক্তি গণ্য ও মান্য নয়।

এখান থেকেই বলা হয়, 'তুমি এমন কথা বলো না, যাতে তোমার কোন ইমাম নেই।'

৪নং নীতি

প্রত্যেক মুজতাহিদ সঠিকতার দিশারী নন।

এ মর্মে মহানবী ﷺ বলেছেন,

« إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ. وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ ».

"বিচারক যদি সুবিচারের প্রয়াস রেখে বিচার করে অতঃপর তা সঠিক হয়,

তবে তার জন্য রয়েছে দুটি সওয়াব। আর সুবিচারের প্রয়াস রেখে যদি বিচারে ভুল করেও বসে, তবে তার জন্যও রয়েছে একটি সওয়াব।" *(বুখারী ৭৩৫২, মুসলিম ৪৫৮৪নং)*

উক্ত হাদীস থেকে এই কথা বুঝা যায় যে, প্রত্যেক মুজতাহিদ সঠিকতায় পৌঁছতে পারেন না। আর হক হল একটিই, একাধিক নয়।

ইবনে উমার ﷺ বলেন, খন্দকের যুদ্ধ শেষে যখন নবী ﷺ ফিরে এলেন, তখন তিনি আমাদেরকে বললেন,

((لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ)).

"তোমাদের মধ্যে কেউ যেন বনী কুরাইযাহ ছাড়া অন্য স্থানে (আসরের) নামায না পড়ে।"

পথে চলতে চলতে আসরের সময় উপস্থিত হল। একদল বলল, সেখানে না পৌঁছে আমরা নামায পড়ব না। (কারণ, তিনি সেখান ছাড়া অন্য স্থানে নামায পড়তে নিষেধ করেছেন।) অপর দল বলল, বরং আমরা পথেই নামায পড়ে নেব। (কারণ, নামাযের সময় এসে উপস্থিত হয়েছে। তাছাড়া) তাঁর উদ্দেশ্য এই ছিল না যে, আসরের সময় হলেও আমরা নামায পড়ব না। (বরং তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, আমরা যেন তাড়াতাড়ি বনী কুরাইযায় পৌঁছে যাই, যাতে সেখানে গিয়ে আসরের সময় হয়। ফলে প্রথম দল পথি মধ্যে নামায পড়ল না। আর দ্বিতীয় দল পড়ে নিল।) অতঃপর নবী ﷺ এর নিকট ঘটনাটি খুলে বলা হলে তিনি কোন দলকেই ভর্ৎসনা করলেন না। *(বুখারী ৯৪৬ নং)*

এ হাদীস থেকে এ কথা বোঝা যায় না যে, প্রত্যেক মুজতাহিদ দলই সঠিক। বরং বুঝা যায় যে, সঠিক দল একটাই, তবে যে দল ভুল করেছে, তারা অপরাধী নয়, বরং তারও একটি সওয়াব আছে।

আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ বলেন, দুই ব্যক্তি সফরে বের হল। নামাযের সময় হলে তাদের নিকট পানি না থাকার কারণে তায়াম্মুম করে উভয়েই নামায পড়ে নিল। অতঃপর ওয়াক্ত শেষ হওয়ার পূর্বেই তারা পানি পেয়ে গেল। ওদের মধ্যে একজন পানি দ্বারা ওযু করে পুনরায় ঐ নামায ফিরিয়ে পড়ল। কিন্তু অপর জন পড়ল না। তারপর তারা আল্লাহর রসূল ﷺ এর নিকট এলে ঘটনা খুলে বলল। তিনি যে নামায ফিরিয়ে পড়েনি তার উদ্দেশ্যে বললেন, "তোমার আমল সুন্নাহর অনুসারী হয়েছে এবং তোমার নামাযও যথেষ্ট (শুদ্ধ) হয়ে গেছে।" আর

যে ওযু ক'রে নামায ফিরিয়ে পড়েছিল, তার উদ্দেশ্যে তিনি বললেন, "তোমার জন্য ডবল সওয়াব।" *(আবূ দাউদ ৩৩৮, নাসাঈ ৪৩৩, দারেমী ৭৪৪, মিশকাত ৫৩৩নং)*

উক্ত হাদীসে 'ডবল সওয়াব' মানে দুইবার নামায পড়ার সওয়াব পাওয়ার কথা রয়েছে। সুতরাং দুটাই সঠিক, তা নয়। আসলে সঠিকতা হল সুন্নাহর উপর আমল করা।

৫নং নীতি

যে কোন মাসআলায় কেউ (সঠিক) দলীলের বিরোধিতা করলে, তার প্রতিবাদ করতে হবে।

ইখতিলাফী (মতভেদপূর্ণ) মাসআলায় কারো প্রতিবাদ বা খন্ডন করা ঠিক নয়, এ কথা হক কথা নয়। বরং হক হল, হক জানার পর হককে বরণ ও গ্রহণ ক'রে নেওয়া। (সহীহ) সুন্নাহ জানার পর অন্য কারো ইজতিহাদের উপর আমল না করা।

তবে প্রতিবাদ ও খন্ডন করতে হবে মুখ দিয়ে বা লেখনীর মাধ্যমে আদব রক্ষার সাথে সঠিকতা স্পষ্ট ক'রে। হাতাহাতি বা গালাগালি ক'রে নয়। কেউ না মানলেও তার দায়িত্ব পালন হয়ে যাবে। কেউ নিজ মতকে অন্যের ঘাড়ে জোরপূর্বক চাপিয়ে দিতে পারে না। যেমন হক জেনেও হককে প্রত্যাখ্যান করা এক প্রকার অহংকার।

৬নং নীতি

মতভেদের গন্ডি থেকে বের হয়ে যাওয়া মুস্তাহাব।

কুরআন ও সুন্নাহর বহু দলীল দ্বারা প্রমাণিত যে, মতবিরোধ করা যাবে না। একতা বজায় রাখা আবশ্যক। বিচ্ছিন্নতা কাম্য নয়। আর তার মানেই মতভেদপূর্ণ মাসআলা থেকে বের হয়ে আসা। অর্থাৎ, যে বিষয়ে মতভেদ আছে, সে বিষয়কে আমলে না আনা।

যেমন উযূতে কতটা মাথা মাসাহ করলে ফরয পালন হবে? এ ব্যাপারে মতভেদ আছে। কেউ বলেন, এক চতুর্থাংশ মাসাহ করলে হবে, কেউ বলেন, কিছু চুল স্পর্শ করলে হবে, আবার কেউ বলেন, পুরো মাথা মাসাহ করতে হবে। এখানে মতভেদ থেকে বের হতে চাইলে পুরো মাথা মাসাহ করতে হবে।

তবে এ ক্ষেত্রে ২টি শর্তারোপ করা হয়েছে ঃ-

এক ঃ এতে যেন কোন সঠিক দলীলকে উপেক্ষা না করা হয়।
যেহেতু দলীল স্পষ্ট হলে তার মাসআলা গ্রহণ করাই নিশ্চিত কর্তব্য।
দুই ঃ মতভেদ থেকে বের হতে গিয়ে যেন অন্য মতভেদে পড়তে না হয়।
সে ক্ষেত্রে ধুলো থেকে বাঁচতে গিয়ে মাটিতে পড়ার মতো ব্যাপার হবে।

৭নং নীতি

যে মত প্রকাশ ক'রে কোন পূর্ববর্তী ইমাম কথা বলেননি, সে মত প্রকাশ ক'রে কথা বলা যাবে না।

উক্তিটি ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলের। (মাজমূউ ফাতাওয়া ২১/২৯১)

সাধারণতঃ মাসায়েল ৩ শ্রেণীর হয়ে থাকে।

প্রথম শ্রেণীর মাসায়েল, যাতে কোন মতভেদ নেই। তাতে বিরোধিতা ক'রে ভিন্ন মত প্রকাশ করা নিশ্চিতভাবে বৈধ নয়।

দ্বিতীয় শ্রেণীর মাসায়েল, যাতে প্রথম যুগ থেকেই মতভেদ চলে আসছে। যার সঠিকতা প্রমাণে প্রচুর ইজতিহাদী মতামত রয়েছে। তার পক্ষপাতিত্বে বাড়াবাড়ি করা উচিত নয়।

তৃতীয় শ্রেণীর মাসায়েল, যার ব্যাপারে পূর্ববর্তী কোন ইমাম বা আলেম কোন মতামত পেশ করেননি। এই শ্রেণীর মাসায়েলে মুখ খুলে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা উচিত নয়।

নিজস্ব মত প্রকাশে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত আলেমদের। যাঁরা আলেম নন, তাঁরা তো পারেনই না। বড় বড় আলেমদের সতর্কতা লক্ষ্য করুন।

জুতার উপরে মাসাহ করার পর পরবর্তীতে জুতা খুলে মসজিদে প্রবেশ করলে পুনরায় উযূতে মাসাহ করার সময় কি কেবল মোযার উপর মাসাহ করা যথেষ্ট হবে?

উত্তরে সঊদী আরবের ফকীহ ও মুফতী ইবনে উষাইমীন (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'আমি উপদেশ দেব মোজার উপর মাসাহ করতে। যেহেতু মানুষ যখন মোজার উপরে মাসাহ করবে, তখন (বুট) জুতা খুললে কোন সমস্যা হবে না। কিন্তু যদি জুতার উপর মাসাহ করে, তাহলে দ্বিতীয়বার উযুর সময় দুই পা ধোয়ার জন্য অবশ্যই মোজা খুলতে হবে। এই মতই অধিকাংশ উলামাগণের। আর আমি জানি না যে, কোন একজন আলেম বলেছেন, যার উপর সে মাসাহ করেছে, সে পবিত্র অবস্থায় তা খুলে ফেললে, সে পবিত্র অবস্থাতেই থাকবে এবং

সে তার নিচের (মোজার) উপর মাসাহ করতে পারবে। সুতরাং যদি উলামাদের কেউ এ কথা বলে থাকেন, তাহলে সেটাই হবে সঠিকতার বেশি নিকটবর্তী।' (লিক্বা শাহরী ২৩/২)

লক্ষ্য করুন, বলেননি যে, আমি বলছি সেটাই সঠিক। বরং বলেছেন, কোন আলেম এ কথা বলে থাকলে সেটাই সঠিকতার বেশি নিকটবর্তী।

আল্লাহু আকবার!

৮নং নীতি

বিচ্ছিন্নভাবে কুরআনের কোনও একটি আয়াত বা কোনও একটি হাদীস থেকে বিধান নেওয়া সঠিক নয়। যেহেতু পাশাপাশি একই বিষয়ীভূত অন্যান্য আয়াত ও হাদীস দেখা জরুরী।

যেমন আগে কুরআন, তারপর হাদীস থেকে বিধান নেওয়া সঠিক নীতি নয়। বরং কুরআন ও হাদীসকে পাশাপাশি এক সাথে রেখে বিধান নিতে হবে।

বিবিধ ফিক্‌হী নীতিমালা

১নং নীতি

إنما الأعمال بالنيات، الأمور بمقاصدها.

প্রত্যেক বিষয় উদ্দেশ্যের সাথে জড়িত।

প্রত্যেক কাজ নিয়তের উপর নির্ভরশীল।

চুক্তি ইত্যাদির ক্ষেত্রে অর্থ ও উদ্দেশ্য বিবেচ্য, কেবল শব্দ ও বাক্য নয়।

উদাহরণ স্বরূপ, কেউ একজনকে কিছু টাকা দিল। সেই টাকা দাতার নিয়ত বা উদ্দেশ্য অনুযায়ী দান বা উপহার হতে পারে, হতে পারে পরিশোধযোগ্য ঋণ, হতে পারে ফেরৎযোগ্য আমানত।

অনুরূপ ঘটে থাকে কসম, নযর, তালাক প্রভৃতি মাসায়েলে।

নিয়তের ভিত্তিতেই একটা কাজই শির্ক, বিদআত, ওয়াজেব, মুস্তাহাব, মুবাহ মাকরূহ বা হারাম হতে পারে।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

((إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى

مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ)).

"যাবতীয় কার্য নিয়ত বা সংকল্পের উপর নির্ভরশীল। আর মানুষের জন্য তাই প্রাপ্য হবে, যার সে নিয়ত করবে। অতএব যে ব্যক্তির হিজরত (স্বদেশত্যাগ) আল্লাহর (সন্তোষ লাভের) উদ্দেশ্যে ও তাঁর রসূলের জন্য হবে; তার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রসূলের জন্যই হবে। আর যে ব্যক্তির হিজরত পার্থিব সম্পদ অর্জন কিংবা কোন মহিলাকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যেই হবে, তার হিজরত যে সংকল্প নিয়ে করবে তারই জন্য হবে।" *(বুখারী ১নং, মুসলিম ১৯০৭নং)*

নিয়তের ফলেই একটি ক্ষুদ্র কাজ মহান রূপে প্রতিষ্ঠালাভ করে এবং একটি মহান কাজ ক্ষুদ্র রূপে পরিগণিত হয়।

পানিতে ডুবে এলেও নিয়ত না থাকলে ফরয গোসল হবে না।

নিয়তের ফলেই বহু মাসায়েলে আমূল পরিবর্তন ঘটে। উদাহরণ স্বরূপ ঃ-

প্রচার করা ও ফিরিয়ে দেওয়ার নিয়তে কুড়িয়ে পাওয়া জিনিস নষ্ট হয়ে গেলে তার দন্ড দিতে হবে না। কিন্তু গোপন ক'রে ব্যবহারের নিয়তে নষ্ট হয়ে গেলে তার দন্ড দিতে হবে।

হারিয়ে যাওয়া জিনিস ফিরিয়ে দেওয়ার উপর পুরস্কার ঘোষিত থাকলে এবং কেউ তা অজানা অবস্থায় কুড়িয়ে পেলে তা মালিককে ফিরিয়ে দেওয়া ওয়াজেব। আর সে পুরস্কারের অধিকারী হবে না। কারণ তার নিয়তে পুরস্কার নেওয়া ছিল না। মালিক স্বেচ্ছায় দিলে ভিন্ন কথা।

যে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে মীরাস থেকে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে মৃত্যুর কাছাকাছি সময়ে তালাক দেয়, তাহলেও সে ওয়ারেস হবে। অনুরূপ কোন স্ত্রী যদি বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটায়, তাহলেও তার স্বামী ওয়ারেস হবে।

যাকাত ফাঁকি দেওয়ার নিয়তে কেউ যদি তার কোন মাল বিক্রয় করে, হেবা করে অথবা অন্য কোন বাহানা ক'রে নিসাব থেকে কম পরিমাণ মাল রাখে, তাহলেও তার জন্য যাকাত মাফ হবে না। (যিদনী ইলমা ২ ৪পৃঃ)

২নং নীতি

الشريعة مبنية على تحقيق المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها.

শরীয়তের আহকামের ভিত্তিই হল মানুষের উপকার ও কল্যাণসাধন এবং তা পরিপূর্ণ করা। আর অকল্যাণ নিশ্চিহ্ন করা অথবা হ্রাস করা।

শরীয়ত যা করতে আদেশ করে, তাতে নিশ্চয় পরিপূর্ণ অথবা অপেক্ষাকৃত অধিক মঙ্গল আছে এবং যা হতে নিষেধ করে, তাতে পরিপূর্ণ অথবা অপেক্ষাকৃত অধিক অমঙ্গল আছে।

ইবনুল কাইয়্যিম (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, 'শরীয়তের বুনিয়াদ ও ভিত্তি হল হিকমত (যৌক্তিকতা) ও বান্দার ইহ-পরকালের কল্যাণের উপর। শরীয়তের পুরোটাই ন্যায়সংগত (ইনসাফপূর্ণ), পুরোটাই করুণা (রহমতময়) এবং পুরোটাই যুক্তিময় (হিকমতপূর্ণ)। বলা বাহুল্য, যে মাসআলা (বা যে বিধানই) ন্যায় থেকে অন্যায়, করুণা থেকে তার বিপরীত, কল্যাণ থেকে অকল্যাণ অথবা যৌক্তিকতা থেকে অযৌক্তিকতার দিকে বের হয়ে যায়, তাহলে সেটা শরীয়ত নয়; যদিও সেটাকে অপব্যাখ্যার মাধ্যমে তাতে প্রবিষ্ট করা হয়েছে। যেহেতু শরীয়ত হল বান্দাগণের জন্য আল্লাহর ন্যায়পরায়ণতা, তাঁর সৃষ্টির জন্য রহমত ও করুণা, তাঁর পৃথিবীতে তাঁর ছায়া এবং তাঁর সেই হিকমত, যা তাঁর অস্তিত্বের উপর ও তাঁর রসূল ﷺ-এর সত্যতার উপর পূর্ণাঙ্গ সত্যনিষ্ঠ প্রমাণ।' *(ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন ৩/৩)*

৩নং নীতি

اليقين لا يزول بالشك. الأصل براءة الذمة، الأصل في الأشياء الطهارة.

নিশ্চিত বিষয়ের নিশ্চয়তা সন্দেহ দ্বারা নষ্ট হয় না।

মূল হল দায়মুক্তি।

বস্তুসমূহ মূলতঃ পবিত্র।

মূলতঃ বিষয়টি যেমন ছিল, তেমনটি থাকবে।

শরীয়তের সরলতার এটিও একটি মৌলিক নীতি। কোনও নিশ্চিত বিষয়ে সন্দেহ এসে উপস্থিত হলে তা বিচার্য নয়। বরং সেটাকে নিশ্চিত মেনেই কাজ করা যাবে। যেমন একটি মানুষ পবিত্র ছিল। হঠাৎ যদি সন্দেহ হয়, সে হয়তো অপবিত্র। তাহলে তার ফলে তার জন্য উযূ করা জরুরী নয়।

মহানবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হল, কোন ব্যক্তি যদি নামাযে সন্দেহ করে যে, হয়তো তার হাওয়া খারিজ হয়ে গেছে, তাহলে সে কি নামায ছেড়ে বের হয়ে আসবে? উত্তরে তিনি বললেন,

« لاَ يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا ».

"না, যতক্ষণ না সে কোন শব্দ শুনেছে অথবা দুর্গন্ধ পেয়েছে।" *(বুখারী ১৩৭,*

২০৫৬, মুসলিম ৮৩০-৮৩১নং)

তিনি নামাযের সন্দেহের ব্যাপারে বলেছেন,

« إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِى صَلاَتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلاَثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلاَتَهُ وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لأَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ ».

যখন তোমাদের কেউ তার নামাযে সন্দেহ করে, সে ৩ রাকআত পড়ল, নাকি ৪ রাকআত? তখন তার উচিত, সন্দেহ দূরে ফেলে নিশ্চিতের উপর ভিত্তি করা। অতঃপর সালাম ফেরার আগে ২টি সিজদা করা। তার ফলে সে যদি ৫ রাকআত পড়ে, তাহলে (ঐ ২ সিজদা) তার নামাযকে (বেজোড় থেকে) জোড় বানিয়ে দেবে। আর যদি সে ৪ রাকআত পূর্ণ করে, তাহলে তা শয়তানের জন্য লাঞ্ছনা হবে।" (মুসলিম ১৩০০নং)

বলা বাহুল্য, কোনও নিশ্চিত প্রমাণিত ও সাব্যস্ত জিনিস কোনও সন্দেহ আসার ফলে তার নিশ্চয়তা দূর হয়ে যায় না। মহান আল্লাহ বলেছেন,

((وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلاَّ ظَنّاً إِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ)) (يونس : ٣٦)

"তাদের অধিকাংশ লোক শুধু ধারণার অনুসরণ করে; নিশ্চয়ই বাস্তব ব্যাপারে ধারণা কোন কাজে আসে না। তারা যা করছে নিশ্চয়ই আল্লাহ সে বিষয়ে সুপরিজ্ঞাত।" (ইউনুস ঃ ৩৬)

((وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً)) (النجم : ٢٨)

"এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান নেই, তারা শুধু অনুমানের অনুসরণ করে। আর সত্যের মুকাবিলায় অনুমানের কোনই মূল্য নেই।" (নাজ্ম ঃ ২৮)

এরই ভিত্তিতে পবিত্রতায় সন্দেহ হলে, মূলতঃ পবিত্রতা অবশিষ্ট থাকবে।

ঋণ পরিশোধ হয়েছে কি না সন্দেহ হলে, মূলতঃ পরিশোধ হয়নি ধরতে হবে।

তালাকে সন্দেহ হলে, মূলতঃ তালাক হয়নি ধরতে হবে।

সেহরীর সময়ে সন্দেহ ক'রে পানাহার করলে রোযা হয়ে যাবে।

(দ্রঃ যিদনী ইলমা ৩১পৃঃ)

৪নং নীতি

الأحكام مبنية على المتماثلات.

শরীয়তের আহকাম (আদেশ-নিষেধ) সাদৃশ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

অনেক ক্ষেত্রে কোন বিষয়ের স্পষ্ট দলীল না পাওয়া গেলে যে বিষয়ে স্পষ্ট দলীল আছে, তার সদৃশ হলে তার সাথে মিলিত ক'রে বিধান দেওয়া হয়। যেমন সূদ হারাম। তার স্পষ্ট পদ্ধতি ছাড়া অস্পষ্ট সদৃশ পদ্ধতিতে কোন বাহানা ক'রে সূদ খাওয়াও হারাম।

ইবনুল কাইয়্যিম (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, 'নির্দেশমূলক শরয়ী আহকাম সবগুলিই অনুরূপ। তুমি দেখতে পাবে, দুটি সদৃশ বিষয়কে সমমান দেওয়া, সদৃশকে সদৃশের সাথে মিলিত করা, বিষয়ের অনুরূপ বিষয়কে (একরূপ) গণ্য করা, বিপরীতমুখী দুটি বিষয়কে পৃথকীকরণ করা এবং একটিকে অন্যটির সাথে একাকার না করার বিধান শামিল রয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহুর শরীয়ত এ ব্যাপারে পবিত্র যে, তা কোন জিনিসকে তার মধ্যে অমঙ্গল থাকার কারণে নিষেধ করছে, অতঃপর সেই জিনিসকে বৈধ করছে, যে জিনিসের মধ্যে হুবহু উক্ত অমঙ্গল অথবা অনুরূপ অথবা তার চাইতে বেশি অমঙ্গল নিহিত রয়েছে। সুতরাং যে ব্যক্তি শরীয়তে এমন কিছু জায়েয আছে মনে করবে, সে আসলে প্রকৃতপক্ষে শরীয়ত চেনেনি এবং তার প্রকৃত মর্যাদা অনুমান করেনি।' *(ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন ১/১৯৫)*

৫নং নীতি

الدين يسر، الضرورات تبيح المحظورات.

দ্বীন পালন সহজ।

সাধ্যের অতীত কারো উপর ভারার্পণ করা হয় না।

প্রয়োজনে হারাম জিনিস হালাল হয়ে যায়।

নিরুপায় বা বাধ্য হলে আদেশ-নিষেধ লাঘব হয়ে যায়।

সংকীর্ণতা এলে প্রশস্তা আসে।

অক্ষমতায় ওয়াজেব থাকে না।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

((لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا

إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ)) (البقرة : ٢٨٦)

"আল্লাহ কাউকেও তার সাধ্যের অতিরিক্ত দায়িত্ব অর্পণ করেন না। যে ভাল উপার্জন করবে সে তার (প্রতিদান পাবে) এবং যে মন্দ উপার্জন করবে, সে তার (প্রতিফল পাবে)। হে আমাদের প্রতিপালক! যদি আমরা বিস্মৃত হই অথবা ভুল করি, তাহলে তুমি আমাদেরকে অপরাধী করো না। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পূর্ববর্তিগণের উপর যেমন গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেছিলে, আমাদের উপর তেমন দায়িত্ব অর্পণ করো না। হে আমাদের প্রতিপালক! এমন ভার আমাদের উপর অর্পণ করো না, যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। তুমি আমাদেরকে ক্ষমা কর, আমাদের পাপ মোচন কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর। তুমি আমাদের অভিভাবক। অতএব সত্য প্রত্যাখ্যানকারী (কাফের) সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে (সাহায্য ও) জয়যুক্ত কর।" *(বাক্বারাহ ঃ ২৮৬)*

((لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً)) (الطلاق : ٧)

"সামর্থ্যবান নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করবে এবং যার জীবনোপকরণ সীমিত, সে আল্লাহ তাকে যা দান করেছেন তা হতে ব্যয় করবে। আল্লাহ যাকে যে সামর্থ্য দিয়েছেন, তার চেয়ে গুরুতর বোঝা তিনি তার উপর চাপান না। আল্লাহ কষ্টের পর স্বস্তি দান করবেন।" (ত্বালাক্ব ঃ ৭)

((فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْراً لِّأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)) (التغابن : ١٦)

"তোমরা আল্লাহকে যথাসাধ্য ভয় কর এবং শোনো, আনুগত্য কর ও ব্যয় কর, তোমাদের নিজেদেরই কল্যাণ হবে। আর যারা অন্তরের কার্পণ্য হতে মুক্ত, তারাই সফলকাম।" (তাগাবুন ঃ ১৬)

((وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)) (الحج : ٧٨)

"তিনি দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন কঠিনতা আরোপ করেননি।" (হাজ্জ ঃ ৭৮)

((يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ)) (البقرة : ١٨٥)

"আল্লাহ তোমাদের (জন্য যা) সহজ (তা) করতে চান, তিনি তোমাদের কষ্ট চান না।" (বাক্বারাহ ঃ ১৮৫)

((يُرِيدُ اللهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفاً)) (النساء : ٢٨)

"আল্লাহ তোমাদের ভার লঘু করতে চান। আর মানুষ সৃষ্টিগতভাবেই দুর্বল।" (নিসা ঃ ২৮)

((وَقَدْ فصَّل لَكُمْ ماحَرَّمَ عليْكُم إلا ما اضْطرِرْتُمْ إليْهِ)) [الأنعام : ١١٩]

"তোমরা নিরুপায় না হলে যা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ, তা তিনি বিশদভাবেই তোমাদের নিকট বিবৃত করেছেন।" (আন্‌আম ঃ ১১৯)

((إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ)) [البقرة : ١٧٣]

"নিশ্চয় (আল্লাহ) তোমাদের জন্য শুধু মৃত জীব, রক্ত, শূকরের মাংস এবং যে সব জন্তুর উপরে (যবেহ কালে) আল্লাহ ছাড়া অন্যের নাম উচ্চারণ করা হয়ে থাকে তা তোমাদের জন্য অবৈধ করেছেন। কিন্তু যে অনন্যোপায় অথচ অন্যায়কারী কিংবা সীমালংঘনকারী নয়, তার কোন পাপ হবে না। আল্লাহ চরম ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।" (বাক্বারাহ ঃ ১৭৩)

ইবনে আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হল, 'কোন্ দ্বীন আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বেশি পছন্দনীয়?' তিনি বললেন,

((الْحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ)).

"একনিষ্ঠ সরল।" *(আহমাদ ২১০৭, আল-আদাবুল মুফরাদ বুখারী ২৮৩, সিঃ সহীহাহ ৮৮ ১নং)*

মহানবী ﷺ বলেন,

((إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّيْنُ إِلاَّ غَلَبَهُ ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا ، وَاسْتَعِينُوا بِالغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ)).

"নিশ্চয় দ্বীন সহজ। যে ব্যক্তি অহেতুক দ্বীনকে কঠিন বানাবে, তার উপর দ্বীন জয়ী হয়ে যাবে। (অর্থাৎ মানুষ পরাজিত হয়ে আমল ছেড়ে দিবে।) সুতরাং তোমরা সোজা পথে থাক এবং (ইবাদতে) মধ্যপন্থা অবলম্বন কর। তোমরা

সুসংবাদ নাও। আর সকাল-সন্ধ্যা ও রাতের কিছু অংশে ইবাদত করার মাধ্যমে সাহায্য নাও।" *(বুখারী ৩৯, ৬৩৬৩নং)*

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ)).

وفي رواية: ((إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ أَنْ تُقْبَلَ رُخَصُهُ كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ)).

"নিশ্চয় মহান আল্লাহ পছন্দ করেন যে, তাঁর অনুমতি গ্রহণ করা হোক; যেমন তিনি অপছন্দ করেন যে, তাঁর অবাধ্যতা করা হোক।" *(আহমাদ ৫৮৬৬, ৫৮৭৩নং)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে, "মহান আল্লাহ পছন্দ করেন যে, তাঁর অনুমতিসমূহ গ্রহণ করা হোক; যেমন তিনি পছন্দ করেন যে, তাঁর ফরযসমূহ পালন করা হোক।" *(বাইহাক্বী, ত্বাবারানী, ইবনে হিব্বান ৩৫৪নং, বাযযার প্রমুখ)*

মহান আল্লাহর শরীয়তের বিধান হিকমতপূর্ণ এবং তাঁর আদেশ-নিষেধ করুণাপূর্ণ। ভারার্পণ ক'রে তিনি প্রয়োজনে তা লাঘবও করেছেন। উলামাগণ কিতাব-সুন্নাহ থেকে এই কষ্ট লাঘবের কারণসমূহ নির্ধারণ করেছেন, যা মোটামুটি ৭ ধরনের ঃ-

এক ঃ সফর

সুতরাং মুসাফির সফরে নামায জমা-কসর করতে পারে। রোযা কাযা করতে পারে।

দুই ঃ অসুস্থতা

পানি ব্যবহারে অসুস্থতা বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা হলে তায়াম্মুম করার অনুমতি আছে। অসুস্থ অবস্থায় নামায বসে বা শুয়ে পড়ার এবং জমা ক'রে পড়ার অনুমতি আছে। রোযা কাযা করার অনুমতি আছে।

তিন ঃ গত্যন্তরহীনতা

কেউ খাবার না পেয়ে গত্যন্তরহীন ও নিরুপায় অবস্থায় হারাম জিনিস (মৃত বা নিষিদ্ধ জীবিত পশু) ভক্ষণ করতে পারে।

পানি না পাওয়া গেলে তায়াম্মুম ক'রে, মাটি না পাওয়া গেলে বিনা গোসল-ওযূতে নামায পড়তে পারে।

কাউকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করতে বাধ্য করা হলে তাকে অপরাধী করা হয় না।

চার ঃ বিস্মৃতি

কেউ ভুলে গিয়ে অবৈধ কোন কিছু ক'রে ফেললে অপরাধী হবে না। ভুলে কিছু খেয়ে ফেললে রোযা নষ্ট হয় না।

পাঁচ ঃ অজ্ঞতা

হজ্জে দম দিয়ে যে ভুল সংশোধন করা যায়, সে ভুল অজান্তে ক'রে ফেললে দম লাগে না।

ছয় ঃ নাবালকত্ব

এই অবস্থায় মানুষ ভারপ্রাপ্ত হয় না।

সাত ঃ কষ্ট ও কঠিনতা

যে আমল করতে কষ্ট হয়, তা না করলে অথবা যেটা থেকে বিরত থাকা প্রায় অসম্ভব হয়, তা করলে অপরাধ হয় না। যেমন ঃ-

বারবার মসজিদে প্রবেশ ক'রে বসতে হলে বারবার তাহিয়্যাতুল মাসজিদ পড়ার দরকার নেই।

প্রস্রাবের জলকণা থেকে বাঁচার উপায় না থাকলে, তা ক্ষমার্হ।

মশা-মাছির রক্ত বা তাদের পায়ে লেগে থাকা অপবিত্রতা থেকে বাঁচা কঠিন, তাই তা ধর্তব্য নয়।

সতর্কতার বিষয় ঃ-

প্রয়োজন অনুমান অনুযায়ী হারাম হালাল হয়। প্রয়োজন যথেষ্ট না হলে অনুমতি গ্রহণ করা যাবে না। নচেৎ কেউ তা করলে 'অন্যায়কারী কিংবা সীমালংঘনকারী' বিবেচ্য হবে।

হালাল খাদ্য পাওয়ামাত্র আর হারাম খাদ্য খাওয়া যাবে না।

পরিশোধে অক্ষম ব্যক্তি ঋণ পরিমাণ যাকাত নিতে পারবে, তার বেশি নিতে পারবে না।

লজ্জা ফরয গোসলের ক্ষেত্রে কোন বাধা নয়। অতএব গোসল না ক'রে নামায ত্যাগ করা বৈধ নয় এবং এটাকে নিরুপায় অবস্থা গণ্য করা সঠিক নয়।

ঘুষ ছাড়া চাকরি হয় না। অতএব ঘুষ দিয়ে আমি চাকরি নিতে বাধ্য।

না, এটা নিরুপায় অবস্থা নয়। কারণ সেই চাকরি ছাড়া অন্য চাকরি, ব্যবসা বা কর্ম আছে, যা ক'রে বেঁচে থাকা যেতে পারে। অনুরূপ বলা যায় কোনও হারাম কাজের অবৈধ চাকরি করার ক্ষেত্রে।

প্রাণহত্যা করা হারাম। কিন্তু নিরুপায় হয়ে প্রয়োজনে হত্যা করা যায়। সে

প্রয়োজন পর্যাপ্ত হতে হবে। যেমন গর্ভবতী মাকে বাঁচাতে গিয়ে তার সন্তানকে হত্যা করা। যদি উভয়কেই বাঁচানো যায়, তাহলে সন্তানকে হত্যা করা যাবে না।

গীবত করা হারাম। কখন তা বৈধ এবং তার প্রয়োজনীয়তা কতটুকু, তা অনুমান ক'রে গীবত করা যাবে। নচেৎ শৈথিল্য ক'রে এই নীতির ছায়া অবলম্বন ক'রে হারামকে হালাল করা যাবে না। *(দ্রঃ যিদনী ইলমা ৪৬পৃঃ)*

৬নং নীতি

لا ضرر ولا ضرار، الضرر يزال.

ক্ষতির কোন স্থান নেই।

না ক্ষতিগ্রস্ত হবে, না ক্ষতিগ্রস্ত করবে।

ক্ষতি দূর করতে হবে।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

((لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ)).

"কারো জন্য অপরের কোন প্রকার ক্ষতি করা বৈধ নয়। কোন দু'জনের জন্য প্রতিশোধমূলক পরস্পরকে ক্ষতিগ্রস্ত করাও বৈধ নয়।"

"কেউ অপরের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না এবং কেউ অপরকেও ক্ষতিগ্রস্ত করবে না।"

অথবা "কেউ অপরের ক্ষতি করবে না এবং অপরের ক্ষতি করার পরিবর্তেও ক্ষতি করবে না।" *(আহমাদ ২৮৬৫, ইবনে মাজাহ ২৩৪১, সহীহুল জামে' ৭৫১৭নং)*

বলা বাহুল্য,

নিজ বা পরের ঈমান, জান, মান, জ্ঞান বা ধনের কোন প্রকার ক্ষতি করা বৈধ নয়।

এমন ক্ষতি করা যাবে না, যাতে নিজের ক্ষতি হয়; যদিও তাতে অপরের লাভ হয়।

এমন ক্ষতি করা যাবে না, যাতে নিজের কোন লাভ আছে অথবা নেই।

এমন ক্ষতি করা যাবে না, যাতে নিজের লাভ আছে এবং পরের ক্ষতি আছে।

জেনেশুনে ইচ্ছাকৃত কোন ক্ষতি করা যাবে না। অজান্তে বা অনিচ্ছাকৃতভাবে কোন ক্ষতি হয়ে গেলে তা দূর করা আবশ্যক।

অপরের ক্ষতি করার প্রতিশোধেও তার কোন ক্ষতি করা বৈধ নয়।

ক্ষতির পথ রুদ্ধ করতে হবে এবং ক্ষতি হয়ে গেলে তা দূর করতে হবে।

শরীয়তের কোন বিধানে মানুষের কোন ক্ষতি নেই। বাহ্যতঃ ক্ষতি মনে হলেও অভ্যন্তরে অপেক্ষাকৃত লাভ আছে।

প্রত্যেক ক্ষতিকর জিনিস ইসলামে নিষিদ্ধ।

যে ক্ষতি সম্পূর্ণ দূর করা সম্ভব নয়, যথাসাধ্য যতটা দূর করা সম্ভব ততটা দূর করতে হবে।

কোন ক্ষতি দূর করতে গিয়ে যদি অধিকতর বড় ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থাকে, তাহলে তা করা যাবে না।

দুটি ক্ষতিকর কাজ বা জিনিসের মধ্যে যদি একটি গ্রহণ না ক'রে কোন উপায় না থাকে, তাহলে যেটার ক্ষতি বেশি বা ব্যাপক, সেটা গ্রহণ না ক'রে, যেটার ক্ষতি কম বা সীমিত, সেটা গ্রহণ করতে হবে।

উদাহরণ ঃ-

নিজের জীবন দিয়ে অপরকে বাঁচাও নয়, নিজেকে বাঁচাও, অপরকেও বাঁচাও।

ধুমপান ক'রে নিজের তথা অপরের ক্ষতি করো না।

ছোঁয়াচে রোগে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না ক'রে নিজের তথা অপরের ক্ষতি করা যাবে না।

কেউ যদি কারো ফসল নষ্ট করে, তাহলে প্রতিশোধে তার ফসল নষ্ট করা যাবে না। বিনিময় দেওয়া-নেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

((إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونِ بِأَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوهَا وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا)).

"কোন স্থানে প্লেগরোগ চলছে শুনলে সেখানে প্রবেশ করো না। আর সেখানে তোমাদের থাকাকালে তা শুরু হলে সেখান হতে বের হয়ে যেয়ো না।" *(বুখারী ৫৭২৮, মুসলিম ৫৯০৫-৫৯০৬নং)*

মহান আল্লাহ বলেছেন,

((وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ)) (البقرة : ٢٣٣)

"জননীগণ তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দু' বছর দুধ পান করাবে; যদি কেউ দুধ

পান করার সময় পূর্ণ করতে চায়। জনকের কর্তব্য যথাবিধি তাদের ভরণ-পোষণ করা। কাউকে তার সাধ্যাতীত কার্যভার দেওয়া হয় না। কোন জননীকে তার সন্তানের জন্য এবং কোন জনককে তার সন্তানের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত করা হবে না। আর (পিতা মারা গেলে) উত্তরাধিকারীর বিধানও অনুরূপ।" *(বাক্বারাহ ঃ ২৩৩)*

এক ব্যক্তি তার বাড়ির জানালা খুলেছে। তাতে তার প্রতিবেশীর মহিলা দেখা যাচ্ছে। তাকে জানালা বন্ধ করতে হবে অথবা যাতে প্রতিবেশীর বাড়িতে নজর না যায়, তার ব্যবস্থা করতে হবে।

সকল সম্পদ দান ক'রে নিজে নিঃস্ব হওয়া তথা ওয়ারেসদেরকে নিঃস্ব করা বৈধ নয়।

৭নং নীতি

العبرة في الأحكام الشرعية بالمعاني والمقاصد لا بالألفاظ.

শরীয়তের আহকামের উক্তিসমূহের অর্থ ও উদ্দেশ্যই বিবেচ্য। কেবল তার শব্দ নয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা বিজয়ের বছরে মক্কায় ঘোষণা করেন যে, "অবশ্যই আল্লাহ ও তাঁর রসূল মদ, মৃত প্রাণী, শূকর ও মূর্তির ব্যবসাকে হারাম ঘোষণা করেছেন।" বলা হল, 'হে আল্লাহর রসূল! মৃত প্রাণীর চর্বি সম্বন্ধে আপনার অভিমত কী? যেহেতু তা দিয়ে পানি-জাহাজ ও চামড়া তেলানো হয় এবং লোকেরা বাতি জ্বালায়?' উত্তরে তিনি বললেন, "না, তা হারাম।"

আর এই সময় তিনি বললেন, "আল্লাহ ইয়াহুদ জাতিকে ধ্বংস করুন। আল্লাহ যখন তাদের উপর মৃত প্রাণীর চর্বি হারাম করলেন, তখন তারা তা গলিয়ে বিক্রি করে তার মূল্য ভক্ষণ করল!" *(বুখারী ২২৩৬, মুসলিম ৪১৩২, নাসাঈ ৪৬৮৩, আহমাদ ১৪৪৯৫ প্রমুখ, মিশকাত ২৭৬৬নং)*

বলা বাহুল্য, যা হারাম, তার মূল্যও হারাম এবং তা দিয়ে ব্যবসাও হারাম। শরীয়তের এই উদ্দেশ্য না বুঝে ইয়াহুদীরা অভিশপ্ত হয়েছিল। *(ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন ২/৯৯)*

৮নং নীতি

للأكثر حكم الكل، الشاذ كالمعدوم.

সংখ্যাগরিষ্ঠতা সাকল্যের মান পায়।

বিরল অস্তিত্ব ধর্তব্য নয়।

বিরল কিছু অস্তিত্বহীনের মতই।

অধিকাংশ যা ঘটে, তার ভিত্তিতে বিচার করা হয়।

সাধারণতঃ যা ঘটে, তার খেয়াল করেই সিদ্ধান্ত আসে, অসাধারণ খেয়াল ক'রে নয়।

মুসলিমরা সন্ত্রাসী নয়। যেহেতু সন্ত্রাসীর সংখ্যা তুলনামূলক নগণ্য।

সফরে সাধারণতঃ কষ্ট হয় বলে নামায জমা-কসর করতে এবং রোযা না রাখতে অনুমতি দেওয়া হয়েছে। সুতরাং কষ্ট না হলেও সে সুযোগ মুসাফির গ্রহণ করতে পারে। যেহেতু সফরে আরামে থাকাটা বিরল।

দুশমন বা বিরোধীদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। যেহেতু সাধারণতঃ তারা সঠিক দেবে না। বিরলভাবে দিতেও পারে।

সাধারণতঃ অপকারী জিনিস ইসলামে হারাম। যদিও বিরলভাবে তাতে কিছু উপকার থাকে।

সাধারণতঃ উপকারী বা উপাদেয় খাদ্য ইসলামে হালাল। যদিও বিরলভাবে তাতে কিছু অপকারিতা পাওয়া যায় অথবা কারো কারো পক্ষে তা অপকারী হয়।

যে মহিলার সর্বদা ইস্তিহাযা থাকে, সে অন্য সাধারণ মহিলাদের মতো ক'রে নামায-রোযা করবে।

সাধারণতঃ সাবালকত্ব এলে মানুষের সমঝ-বুঝ পরিপক্ক হয়, তাই সেই অবস্থা এলে শরীয়তের ভারপ্রাপ্ত হয়। যদিও অনেক সাবালকের তেমন জ্ঞান থাকে না অথবা অনেকের জ্ঞান সাবালক হওয়ার আগেও পেকে যায়।

৯নং নীতি

العادة محكمة.

প্রচলিত রীতি ফায়সালাকারী।

স্বাভাবিক প্রচলন শর্তের মতই।

অনেক সময় শরীয়তে এই নীতি প্রয়োগ করা হয়। যেমন ঃ-

মহান আল্লাহ বলেছেন,

((وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)) (البقرة : ٢٢٨)

"নারীদের তেমনি ন্যায়-সঙ্গত অধিকার আছে, যেমন আছে তাদের উপর পুরুষদের। কিন্তু নারীদের উপর পুরুষদের কিছুটা মর্যাদা আছে। আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (বাক্বারাহ ঃ ২২৮)

এখানে ন্যায়-সংগত বলতে সমাজে প্রচলিত রীতিতে যে অধিকার আছে সেটা।

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, একদা আবূ সুফয়ানের স্ত্রী হিন্দ্ নবী ﷺ-কে বললেন যে, 'আবূ সুফয়ান একজন কৃপণ লোক। আমি তার সম্পদ থেকে (তার অজান্তে) যা কিছু নিই, তা ছাড়া সে আমার ও আমার সন্তানকে পর্যাপ্ত পরিমাণে খরচ দেয় না।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

((خُذِيْ مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالمَعْرُوفِ)) .

"তুমি তোমার ও তোমার সন্তানের প্রয়োজন মোতাবেক খরচ (তার অজান্তে) নিতে পার।" *(বুখারী ৫৩৬৪, মুসলিম ৪৫৭৪নং)*

এখানে প্রয়োজন ও প্রচলিত রীতি মোতাবেক যতটুক নেওয়া দরকার, ততটুকু নিতে অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তার বেশি নিলে অপরাধ হবে। পরিমাণ নির্ধারণ করবে প্রয়োজন ও রীতি, শরীয়ত নয়।

প্রত্যেক বিশেষ্যের সংজ্ঞা নির্ধারণ করবে আভিধানিক ও ভাষাবিদগণ। যেমন চাঁদ, সূর্য, আকাশ, পৃথিবী, সমুদ্র, পর্বত ইত্যাদি শব্দের অর্থ।

বহু বিশেষ্যের সংজ্ঞা নির্ধারণ করবে শরীয়ত। যেমন মু'মিন, কাফের, মুনাফিক, স্বালাত, যাকাত, সিয়াম, হজ্জ ইত্যাদি।

আর যে বিশেষ্যের অভিধানে বা শরীয়তে সংজ্ঞা নেই, তার সংজ্ঞা গ্রহণ করতে হবে সমাজে প্রচলিত পরিভাষা থেকে। যেমন ক্রয়-বিক্রয়, দান, ভাড়া ইত্যাদি। (মাজমূউ ফাতাওয়া ২৯/ ১৫)

আর অবশ্যই সমাজে প্রচলিত সে প্রথা বা রীতি শরীয়তবিরোধী হলে চলবে না।

উদাহরণ ঃ-

এক বোতল পানির দাম নিয়ে কলহ বাধলে তার ফয়সালা দেবে ক্রয়-বিক্রয় স্থানের প্রচলিত মূল্য। সাধারণ স্থানে হলে সেখানকার প্রচলিত দর। আর এয়ারপোর্ট হলে সেখানকার প্রচলিত দর।

কেউ কোন পাত্রে উপহার পাঠালে পাত্রটি কি ফিরে দিতে হবে, নাকি সেটাও উপহার? প্রচলিত রীতি বলবে তার উত্তর।

কেউ মক্কায় কোন জিনিসের দাম এক হাজার নির্ধারণ ক'রে ধারে জিনিস কিনলে দাম দেওয়ার সময় যদি ক্রেতা বলে এক হাজার রিয়াল এবং বিক্রেতা বলে ডলার, তাহলে মক্কার বাজারে প্রচলিত মুদ্রাই হবে ফায়সালা। (যিদনী ইলমা ৬২পৃঃ)

১০নং নীতি

الأحكام الشرعية المحددة لا تتغير بتغير الزمان أو المكان.

নির্ধারিত বা নির্দিষ্ট শরয়ী আহকাম স্থান-কালের পরিবর্তনে পরিবর্তিত হয় না।

ইবনুল ক্বাইয়িম (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, 'আহকাম হল দুই শ্রেণীর ঃ-

প্রথম শ্রেণীর আহকাম নিজ অবস্থা থেকে পরিবর্তিত হয় না, না কালের পরিবর্তনে, না স্থানের পরিবর্তনে, আর না-ই ইমামগণের ইজতিহাদী কারণে। যেমন ওয়াজেব ও হারাম হওয়ার বিষয়সমূহ, অপরাধের নির্ধারিত দন্ডবিধি প্রভৃতি। এমন আহকাম কোন কিছুর পরিবর্তন বা বিপরীত ইজতিহাদের ফলে পরিবর্তিত হয় না।

দ্বিতীয় শ্রেণীর আহকাম কাল, স্থান ও অবস্থান্তরে সার্বিক কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রেখে পরিবর্তিত হয়। (ইগাষাতুল লাহফান ১০/৩৩০)

যেমন হাদীসে দুধ জমা ক'রে রাখা বকরী ক্রয় ক'রে প্রতারিত হয়ে তা ফেরৎ দিলে সঙ্গে এক সা' খেজুর দিতে বলা হয়েছে। (বুখারী ২১৪৯) কিন্তু স্থান হিসাবে এই বিধান পাল্টে যাবে। সুতরাং যে দেশে খেজুর নেই, সে দেশের লোকেরা তার বদলে ১ সা' পরিমাণ প্রধান খাদ্য দিতে বাধ্য হবে।

১১নং নীতি

دفع المضرة مقدم على جلب المنفعة، درء المفاسد أولى من جلب المصالح.

মঙ্গল আনয়নের উপর অমঙ্গল দূরীকরণ অগ্রগণ্য।

পুণ্য করার চাইতে পাপ না করাটা বেশি উত্তম।

বাত ভালো করতে গিয়ে যদি বেদনার সৃষ্টি হয়, তাহলে বাত ভালো না করাই ভালো।

শরীয়তের বিধানসমূহে এটাই লক্ষণীয় যে, তাতে কেবল মানুষের (পরিপূর্ণ অথবা তুলনামূলক বেশি) কল্যাণই আছে। আর আছে, যাতে কোন প্রকারে মানুষের (পরিপূর্ণ অথবা তুলনামূলক বেশি) অকল্যাণ না ঘটে। সুতরাং কোনও

সময়ে যদি মানুষ নিশ্চিত এই দ্বন্দে পড়ে যে, কল্যাণ করতে গিয়ে কোন অকল্যাণ ঘটে যাবে বা ঘটে যেতে পারে, তাহলে সে কল্যাণ করবে না, যাতে অকল্যাণ না ঘটে।

এ মর্মে হাদীস এসেছে, একদা নবী ﷺ আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)কে বললেন,

« لَوْلاَ أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُو عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ – أَوْ قَالَ بِكُفْرٍ – لأَنْفَقْتُ كَنْزَ الْكَعْبَةِ فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَلَجَعَلْتُ بَابَهَا بِالأَرْضِ وَلأَدْخَلْتُ فِيهَا مِنَ الْحِجْرِ ».

"তোমার সম্প্রদায় যদি জাহেলী বা কুফরী যুগের কাছাকাছি না হতো, তাহলে অবশ্যই আমি কা'বার ধনভান্ডারকে আল্লাহর পথে ব্যয় করতাম, তার দরজাকে মাটি বরাবর (নিচু) করতাম এবং হিজ্‌রকে তার শামিল ক'রে দিতাম।" (মুসলিম ৩৩০৭নং)

শরীয়তে মদকে হারাম করা হয়েছে। লোকে যুক্তি দিয়ে বলে, তাতে উপকার আছে। মহান আল্লাহ বলেন,

((يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا)) (البقرة : ٢١٩)

"লোকে তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বল, 'উভয়ের মধ্যে মহাপাপ এবং মানুষের জন্য (যৎকিঞ্চিৎ) উপকারও আছে, কিন্তু ওদের পাপ উপকার অপেক্ষা অধিক।" (বাক্বারাহ ঃ ২ ১৯)

সুতরাং যেহেতু অপকারিতা বেশি, তাই মদ হারাম।

ফিতনার সময় অস্ত্র বিক্রয় হারাম। যেহেতু তাতে অকল্যাণের আশঙ্কা বেশি।

ধাক্কা দিয়ে হাজারে আসওয়াদ পাথর চুম্বন করা বৈধ নয়।

বেগানাকে (মাহরাম ব্যতীত) নির্জনে কুরআন পড়ানো বৈধ নয়।

রাস্তার ধারে বসা যাবে না, কারণ তাতে ফিতনা বা পাপের আশঙ্কাই বেশি। বসলে শর্তসাপেক্ষে বসতে হবে।

জেনে রাখা দরকার যে, অকল্যাণের চাইতে কল্যাণের পরিমাণ যদি বেশি হয়, তাহলে সে ক্ষেত্রে কথা ভিন্ন।

১২নং নীতি

আমাদের ইবাদত কখনো যথেষ্ট হয়। মানে দায়িত্বমুক্ত হয়ে গোনাহ থেকে

বাঁচা যায়, কিন্তু তাতে সওয়াব পাওয়া যায় না।

কখনো (নিয়তের কারণে) সওয়াব পাওয়া যায়, কিন্তু পরিপূর্ণ না হওয়ায় যথেষ্ট হয় না।

আবার কখনো যথেষ্ট হয় এবং পরিপূর্ণ সওয়াবও পাওয়া যায়।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

رُبَّ صَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ صِيَامِهِ الْجُوعُ وَالْعَطَشُ , وَرُبَّ قَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ قِيَامِهِ السَّهَرُ.

"কোন কোন রোযাদার আছে, রোযা থেকে তার ভাগে জোটে (কেবল) ক্ষুধা ও পিপাসা। আর কোন কোন তাহাজ্জুদগুযার আছে, তাহাজ্জুদ থেকে তার ভাগে জোটে (কেবল) রাত্রি জাগরণ।" *(আহমাদ ৮৮৫৬, ত্বাবারানীর কাবীর ১৩২৩২, বাইহাক্বী ৮৫৭২, হাকেম ১৫৭১, ইবনে হিব্বান ৩৪৮১, সঃ জামে' ৩৪৯০নং)*

(বিশদে দ্রঃ মাজমূউ ফাতাওয়া ১৯/৩০৩)

১৩নং নীতি

প্রকাশ্য জিনিস গুপ্ত জিনিসের লক্ষণ।

ভালো বীজের ভালো গাছ হয়।

ঈমান সঠিক হলে বাহ্যিক আচরণ ও বেশভূষা সুন্দর হয়। মনের জমি ভালো হলে ভালো ফল-ফসল হয়।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لاَ يَخْرُجُ إِلاَّ نَكِداً كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ (الأعراف : ٥٨)

"উৎকৃষ্ট ভূমি তার প্রতিপালকের নির্দেশে ফসল উৎপন্ন করে এবং যা নিকৃষ্ট তাতে কঠিন পরিশ্রম ব্যতীত কিছুই জন্মায় না। এভাবে কৃতজ্ঞ সম্প্রদায়ের জন্য আমি নিদর্শনসমূহ বিভিন্নভাবে বিবৃত ক'রে থাকি।" (আ'রাফ ঃ ৫৮)

মহানবী ﷺ বলেছেন,

أَلاَ وَإِنَّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَت صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ ، أَلاَ وَهِيَ القَلْبُ)).

"শোন! দেহের মধ্যে একটি মাংসপিন্ড রয়েছে; যখন তা সুস্থ থাকে, তখন গোটা দেহটাই সুস্থ হয়ে থাকে। আর যখন তা খারাপ হয়ে যায়, তখন গোটা দেহটাই খারাপ হয়ে যায়। শোন! তা হল হৃৎপিন্ড (অন্তর)।" *(বুখারী ৫২,*

২০৫১, মুসলিম ৪১৭৮-নং)

অবশ্য কখনো কখনো বাইরের আচরণ হৃদয়ের উপর প্রভাব ফেলে। নামাযের কাতার বাঁধতে মতবিরোধ করলে সে মতবিরোধ হৃদয়ে স্থান পাবে।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

« لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ ».

"তোমরা তোমাদের কাতার সোজা কর, নচেৎ আল্লাহ অবশ্যই তোমাদের হৃদয়-মাঝে (পরস্পরের প্রতি) বিদ্বেষ সৃষ্টি করে দেবেন।" *(আবূ দাউদ ৬৬২, ইবনে হিব্বান ২১৭৬, ইবনে খুযাইমা ১৬০, সহীহ তারগীব ৫১২নং)*

কোন মেয়েকে পুরুষদের আচরণে ও লেবাস-পোশাকে অভ্যস্ত করালে তার প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটে।

যেমন অনেক সময় বাইরের কাজ ভিতরের দলীল হয় না। মুনাফিকী আচরণ তার প্রমাণ। অনেকের বাহ্যিক সাজসজ্জা ও আচরণ সুন্দর হয়, কিন্তু মন হয় নোংরা।

সুতরাং মু'মিন নারী-পুরুষের উচিত, দেহ-মন ও কর্ম, সবের প্রতি যত্ন নেওয়া। আর প্রাধান্য দেওয়া উচিত, অন্তর ও আমলকে।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

((إِنَّ اللهَ لاَ يَنْظُرُ إِلَى أَجْسَادِكُمْ ، وَلاَ إِلَى صُوَرِكُمْ ، وَلَكِن يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعمَالِكُم)).

"নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তোমাদের দেহ এবং তোমাদের আকৃতি দেখেন না, বরং তিনি তোমাদের অন্তর ও আমল দেখেন।" *(মুসলিম ৬৭০৭-৬৭০৮-নং)*

বিদআতের নীতিমালা

দ্বীনের মধ্যে উদ্ভাবিত বিষয়, যা দ্বীন নয়, তাকে বিনা কোন দলীলে দ্বীন বলে পালন করা কর্মই হল বিদআত। এ বিষয়ে রয়েছে অনেক নীতিমালা।

১নং নীতি

মূলতঃ ইবাদত নিষিদ্ধ, যতক্ষণ না তা বিধিবদ্ধ হওয়ার দলীল পাওয়া যাবে। যেমন পার্থিব চালচলন মূলতঃ বৈধ, যতক্ষণ না তা নিষিদ্ধ হওয়ার দলীল

পাওয়া যাবে।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

((مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ ،

وفي رواية لمسلم : ((مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيهِ أَمْرُنا فَهُوَ رَدٌّ)).

"যে ব্যক্তি আমাদের এই দ্বীনে (নিজের পক্ষ থেকে) কোন নতুন কথা উদ্ভাবন করল---যা তার মধ্যে নেই, তা প্রত্যাখ্যানযোগ্য।" *(বুখারী ২৬৯৭, মুসলিম ৪৫৮৯নং)*

মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় আছে, "যে ব্যক্তি এমন কাজ করল, যে ব্যাপারে আমাদের নির্দেশ নেই, তা বর্জনীয়।" *(৪৫৯০নং)*

২নং নীতি

শরীয়তে বিদআতে হাসানাহ (ভালো বিদআত) ও বিদআতে সাইয়িআহ (খারাপ বিদআত) বলে কিছু নেই; বরং সকল বিদআতই ভ্রষ্টতা।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

((وَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلافاً كَثِيراً ، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وسُنَّةِ الْخُلَفاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بالنَّواجِذِ ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ ؛ فإنَّ كلَّ بدعة ضلالة)).

"(স্মরণ রাখ) তোমাদের মধ্যে যে আমার পর জীবিত থাকবে, সে অনেক মতভেদ বা অনৈক্য দেখবে। সুতরাং তোমরা আমার সুন্নত ও সুপথপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের রীতিকে আঁকড়ে ধরবে এবং তা দাঁত দিয়ে মজবূত ক'রে ধরে থাকবে। আর তোমরা দ্বীনে নব উদ্ভাবিত কর্মসমূহ (বিদআত) থেকে বেঁচে থাকবে। কারণ, প্রত্যেক বিদআতই ভ্রষ্টতা।" *(আবু দাউদ ৪৬০৯, তিরমিযী ২৬৭৬, ইবনে মাজাহ ৪২নং)*

আর নাসাঈর এক বর্ণনায় আছে, "আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতা জাহান্নামে (নিয়ে যায়)।" *(১৫৭৮নং)*

'বিদআতের কোন ভালো-মন্দ নেই, বরং তার সবটাই ভ্রষ্টতা।' এ কথাই বুঝেছেন সাহাবাগণ।

আব্দুল্লাহ বিন উমার ﷺ বলেছেন, 'প্রত্যেক বিদআতই ভ্রষ্টতা; যদিও লোকেরা তাকে ভালো বলে জানে।' (লালকাঈ ১/৯২)

এখান থেকে তাদের বিভ্রান্তির কথাও স্পষ্ট হয়, যারা বলে যে, বিদআত পাঁচ

ভাগে বিভক্ত ঃ ওয়াজেব, মুস্তাহাব, মুবাহ, মকরূহ ও হারাম।

প্রকাশ থাকে যে, ইসলামে ভালো রীতি চালু করার সওয়াব আছে। তবে তার মানে নব আবিষ্কৃত রীতি নয়। শরীয়তসম্মত রীতি।

পার্থিব বিষয়ে নব আবিষ্কৃত বিষয় বিদআতের মধ্যে গণ্য নয়। যেমন ইবাদতের অসীলা স্বরূপ পার্থিব বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা বিদআতের পর্যায়ভুক্ত নয়।

আভিধানিক অর্থে বিদআত, শরয়ী পরিভাষায় নিষিদ্ধ বিদআত নয়।

'মুসলিমরা যা ভালো মনে করে, তা আল্লাহর নিকট ভালো।' এ কথা দিয়ে বিদআত করা প্রমাণিত হয় না। এ কথার উদ্দেশ্য হল মুসলিমদের ইজমা।

৩নং নীতি

বিদআতের সবটাই হারাম, মকরূহ বিদআত বলে কিছু নেই।

যা করলে গোনাহ হয় না এবং না করলে সওয়াব পাওয়া যায়।

৪নং নীতি

সুন্নাহ মোতাবেক অল্প আমল করা বিদআতী বেশি আমল করা থেকে উত্তম।

ইবনে মাসঊদ ﷺ বলেছেন, 'বিদআতী নিয়মে অনেক আমল করার চাইতে সুন্নাহ অনুযায়ী অল্প আমল করা অধিক উত্তম।' *(দারেমী ২২৩নং, লালকাঈ ১/৫৫, ৮৮)*

অনুরূপ বলেছেন, হাসান বাসরীও। *(আল-লালকাঈ ১/৫৭, ১৯নং)*

৫নং নীতি

নিয়ত ভালো হলেই অথবা কাজ ভালো হলেই সেটা গ্রহণযোগ্য হবে এবং বিদআত হবে না, তা নয়।

বরং ভালো কাজ ভালো নিয়তে বিনা দলীলে করলেই বিদআত হয়।

খারাপ আমল তো কবুলযোগ্যই নয়, বরং তা শাস্তিযোগ্য। আর ভালো আমল কবূলের মৌলিক শর্ত হল, তাতে ইখলাস থাকা এবং তা সুন্নাহর অনুগামী হওয়া। বলা বাহুল্য, ভালো আমলের মধ্যে ইখলাস না থাকলে শির্ক হয়, আর সুন্নাহ না থাকলে বিদআত হয়।

ইবনে মাসঊদ ﷺ একদল লোককে হালকাবদ্ধভাবে যিক্‌র করতে দেখে বললেন, 'তাঁর শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে! তোমরা এমন মিল্লাতে আছ যা মুহাম্মাদ ﷺ-এর মিল্লাত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর অথবা তোমরা ভ্রষ্টতার

দ্বার উদ্‌ঘাটনকারী?!' ওরা বলল, 'আল্লাহর কসম, হে আবু আব্দুর রহমান! আমরা ভালোরই ইচ্ছা করেছি।' তিনি বললেন, 'কিন্তু কত ভালোর অভিলাষী ভালোর নাগালই পায় না!' *(দারেমী ১/৬৮, সিলসিলাহ সহীহাহ ২০০৫নং)*

৬নং নীতি

কোনও আমলে তা সুন্নত নাকি বিদআত, এ নিয়ে উলামাদের মতভেদ থাকলে তা করার সুযোগ আছে ধারণা করা ঠিক নয়।

বরং সে ক্ষেত্রে সঠিক দলীল দেখে হকপন্থী আলেমের অনুসরণ করতে হবে। হক-বাতিল বুঝা না গেলে সাবধানতামূলক আচরণ এই যে, সে আমল না করা। কারণ করলে তা সুন্নত হলে সওয়াব পাওয়া যাবে, আর না করলে বিদআতের গোনাহ তথা মতভেদ থেকে দূরে থাকা যাবে। আর কর্তব্য হল, সওয়াব অর্জন করার চাইতে গোনাহ বর্জন করা।

৭নং নীতি

আমলকারীর সংখ্যাগরিষ্ঠতা বা আমল বহুল-প্রচলিত হওয়া তা বিধিসম্মত হওয়ার দলীল নয়।

যেহেতু কোনও আমল বিধিসম্মত, বিদআতমুক্ত ও সঠিক হতে শরয়ী দলীল আবশ্যক।

ফুযাইল বিন ইয়ায বলেন, 'তুমি হিদায়াতের পথ অনুসরণ কর এবং তোমাকে সে পথের পথিকদের সংখ্যালঘিষ্ঠতা তোমার কোন ক্ষতি করবে না। আর ভ্রষ্ট পথসমূহ থেকে সুদূরে থাক এবং হত মানুষদের সংখ্যাগরিষ্ঠতায় তুমি ধোঁকা খেয়ো না।' *(আল-ই'তিসাম ১/১১২)*

৮নং নীতি

কোনও আমলের কিছু অংশে বিদআতী কিছু করলে গোটা আমলটাই বরবাদ হয়ে যায় না। এ ক্ষেত্রে কেবল সে অংশটুকুই নষ্ট হবে। তবে যদি সে বিদআত এমন হয়, যাতে ইবাদতটাই কবুল হবে না, তাহলে ভিন্ন কথা।

যেমন নামাযে কোন বিদআতী দুআ পড়লে পুরো নামাযটাই বাতিল হয় না। কিন্তু যদি কেউ একটা রাকআত বেশি করে, তাহলে পুরো নামাযটাই বাতিল হয়ে যায়।

৯নং নীতি

শরীয়তে যে ইবাদত সাধারণভাবে করতে বলা হয়েছে, সে ইবাদতকে যদি কোন সময়, স্থান, পদ্ধতি বা সংখ্যা দ্বারা নির্দিষ্ট ক'রে দেওয়া হয়, তাহলে তা বিদআত বলে গণ্য হবে।

যেমন মহান আল্লাহ তাঁর নবীর প্রতি দরূদ পড়তে বলেছেন। হাদীসে বেশি বেশি দরূদ পড়ার কথা আছে। কিন্তু কেউ যদি প্রতিদিন হাজার বার পড়ে অথবা ফরয নামাযের পরে পড়ে অথবা দাঁড়িয়ে পড়ে অথবা নির্দিষ্ট জায়গা গিয়ে পড়ে, তাহলে প্রত্যেকটা কাজ বিদআত রূপে পরিগণিত হবে।

১০নং নীতি

যে ইবাদত নির্দিষ্ট সময় বা পদ্ধতিতে পরিপূর্ণরূপে সম্পাদন করা বিধিবদ্ধ করা হয়েছে, সেই ইবাদতের পূর্ণটা না ক'রে তার কিয়দংশ পালন করা অথবা ভিন্ন সময়ে করা বিদআত বলে গণ্য হবে।

যেমন পুরো নামায না পড়ে ১টি বা ২টি সিজদা করা।

যুলহজ্জের ৯ তারীখ ছাড়া অন্য দিনে আরাফায় অবস্থান ক'রে ইবাদত করা, অন্য রাতে মুযদালিফায় অবস্থান ক'রে যিক্‌র করা, অন্য দিনে জামারাতে পাথর মারা, হজ্জ-উমরাহ ছাড়া সাঈ করা ইত্যাদি।

১১নং নীতি

যে ইবাদত যে পদ্ধতিতে বিধিবদ্ধ হয়েছে, সে ইবাদত সে পদ্ধতি ছেড়ে মগনগড়া পদ্ধতিতে করা অথবা যে ইবাদত যে কারণে বিধিবদ্ধ হয়েছে, সে ইবাদত সে কারণ ছেড়ে মনগড়া কারণে করা বিদআত।

যেমন গানের সুরে কুরআন পড়া বা আযান দেওয়া।

অকারণে বা অন্য কারণে ইস্তিখারা, হাজত, খুসুফ ইত্যাদির নামায পড়া।

১২নং নীতি

মুবাহ কর্মসমূহের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্যলাভ করা বিদআত।

যে কাজে সওয়াব নেই, গোনাহও নেই, কেবল সেই কাজের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা বিধেয় নয়, বিদআত। যেমন খেলাধূলার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্যলাভের নিয়ত ইত্যাদি।

অবশ্য বৈধ কাজ যদি অন্য বিধেয় কাজের অসীলা হয়, তাহলে ভিন্ন কথা।

মাথায় রুমাল ব্যবহার বৈধ। কিন্তু তাকে সুন্নত বা দ্বীন মনে করা বিদআত।

১৩নং নীতি

দাওয়াতের ক্ষেত্রে নতুন পদ্ধতি বিদআত বলে গণ্য।

আল্লাহর ইবাদতের দিকে আহবান নবী ও সাহাবাগণের পদ্ধতি অনুসারে করতে হবে। নচেৎ অভিনব পদ্ধতি উপকারী বা ভালো মনে ক'রে করলে তা বিদআত হবে। যেহেতু দ্বীন পরিপূর্ণ হয়েছে নববী যুগে। সুতরাং তখন যেটা দ্বীন ছিল না, আজও সেটা দ্বীন হতে পারে না।

এই জন্যই দাওয়াতের পদ্ধতিতে গজল, রাজনীতি, নাটক ইত্যাদিকে (তাতে মহিলা বা মিউজিক না থাকলেও) বিদআত গণ্য করা হয়।

প্রকাশ থাকে যে, দাওয়াতী কাজে ব্যবহৃত পার্থিব সরঞ্জাম, যেমন মাদ্রাসা, বই-পুস্তক, পত্র-পত্রিকা, ক্যাসেট, সিডি, মাইক, ঘড়ি, নেট ইত্যাদির ব্যবহার বিদআতের সংজ্ঞার আওতাভুক্ত নয়।

১৪নং নীতি

'মাস্বালিহ মুরসালাহ' বিদআতের অন্তর্ভুক্ত নয়।

'মাস্বালিহ' মানে কল্যাণ, উপকারিতা, স্বার্থ ইত্যাদি। আর 'মুরসালাহ' মানে ছেড়ে রাখা।

এমন কিছু কল্যাণমূলক বিষয় আছে, যা মানুষের জন্য উপকার আনে এবং ক্ষতি দূর করে, যেগুলির ব্যাপারে শরীয়ত নীরব আছে, সে ব্যাপারে কোন আদেশ-নিষেধের বিধান নেই, সে বিষয়গুলি গ্রহণ করা বিদআত নয়। কারণ শরীয়তের লক্ষ্যই হচ্ছে, মানুষের কল্যাণ সাধন করা এবং অকল্যাণ দূর করা।

তবে উভয়ের মাঝে পার্থক্য খুবই সূক্ষ্ম। এমন কাজ, যে কাজের চাহিদা নবী ﷺ-এর যুগে ছিল না অথবা চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তা ছিল, কিন্তু কোন বাধার কারণে তা করা যায়নি অথচ সেটা উম্মাহর জন্য কল্যাণকর, সেই কাজ হল 'মাস্বালিহ মুরসালাহ'। আর বিদআত হল এর বিপরীত।

যেমন ঈদের নামাযের জন্য আযান দেওয়া। এটা সর্বজনীন একটি কল্যাণকর কাজ। তাঁর যুগে এর চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তা ছিল। তা করতেও কোন বাধা ছিল না। কিন্তু তিনি করেননি। সুতরাং তাঁর পরবর্তীতে কেউ করলে তা বিদআত বলে গণ্য হবে।

জুমআর প্রথম আযানকে এই কারণ দর্শিয়েই অনেকে বিদআত বলেছেন। তবে অনেকে মনে করেন যে, এর চাহিদা নবী ﷺ-এর যুগে ছিল না, যেমন

উষমান ﷺ-এর যুগে ছিল।

আর 'মাস্বালিহ মুরসালাহ' যেমন কুরআনকে একত্র ক'রে গ্রন্থের রূপ দেওয়া। কুরআনে যের-যবর ব্যবহার করা। হাদীস সংগ্রহ ক'রে গ্রন্থের রূপ দেওয়া। জেলখানা ও মাদ্রাসা নির্মাণ করা। ইত্যাদি।

১৫নং নীতি

কাউকে কোন বিদআত করতে দেখলেই তাকে বিদআতী ধারণা করা সঠিক নয়।

যেহেতু হতে পারে, সে জানে না যে সেটা বিদআত। অথবা সে তা ভুলক্রমে করেছে। সুতরাং তার সন্দেহ দূর ক'রে হুজ্জত কায়েম করার পর সে তা না মানলে তাকে বিদআতী বলা যাবে।

তাছাড়া বিদআতেরও বিভিন্ন প্রকার আছে। কিছু বিদআত করলে মুসলিম কাফের হয়ে যায়। অন্য বহু বিদআত আছে, তা করলে মানুষ মুশরিক বা কাফের হয়ে যায় না। যেমন অনেকে আছে বিদআতী, কিন্তু সে তার বিদআতের দিকে আহবান করে না। আর প্রত্যেকর স্ব-স্ব বিধান আছে, যা কেবল বড় বড় আলেমগণই প্রয়োগ করতে পারেন।

১৬নং নীতি

কোন এমন প্রমাণসাপেক্ষ্য আমল যা কুরআন-সুন্নাহ ছাড়া প্রমাণিত হতে পারে না, তা যদি কোন সাহাবী কর্তৃক শুদ্ধভাবে প্রমাণিত হয়, তাহলে তাকে বিদআত বলা যাবে না।

যেহেতু তিনি ওয়াহীর পরিবেশে থেকে তা গ্রহণ করেছেন। অবশ্য তা যদি তাঁর নিজস্ব ইজতিহাদ হয় অথবা সুন্নাহ-বিরোধী অথবা অন্য সাহাবীর রায়-বিরোধী হয়, তাহলে ভিন্ন কথা।

জ্ঞাতব্য যে, অনেকে না জেনে বলে, 'বিদআত তার দলীল কী?'

আসলে যার বিদআত সম্বন্ধে সঠিক ধারণা নেই, সেই এ কথা বলে। যেহেতু যার কোন দলীল নেই, তাই হল বিদআত।

অনেকে বিদআত ক'রে বলে, 'এটা করতে নিষেধ আছে নাকি?'

আসলে নিষেধ থাকলে তো সেটা হারাম বলা হতো, বিদআত নয়।

যে প্রক্রিয়াতে হাদীসকে সহীহ-যয়ীফ নির্ধারণ সঠিক নয়

প্রথমতঃ যে প্রক্রিয়াতে হাদীসকে সহীহ বলা যায় না।

সহীহ হাদীস তাকে বলে, যার মধ্যে ৫টি শর্ত বর্তমান থাকে ঃ-

১। সনদ বা সূত্র অবিচ্ছিন্ন থাকা। প্রত্যেক বর্ণনাকারীর ঊর্ধ্বতন বর্ণনাকারী থেকে স্বকর্ণে হাদীস শোনা প্রমাণিত হওয়া।

২। বর্ণনাকারীদের সৎ, বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য হওয়া।

৩। তাঁদের স্মৃতিশক্তি তথা নির্ভুল বর্ণনা-ক্ষমতা বিদ্যমান থাকা।

৪। হাদীসটি তুলনামূলক অধিকতর সহীহ হাদীসের বিরোধী প্রমাণিত না হওয়া।

৫। যে কোনও সূক্ষ্ম দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত হওয়া।

সুতরাং উক্ত ৫টি শর্তের মধ্যে যে কোনও একটি অবর্তমান থাকলে হাদীস 'যয়ীফ' বলে সাব্যস্ত হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, হাদীসকে 'সহীহ' সাব্যস্ত করার মানসে এ ছাড়া আরো কিছু প্রক্রিয়া প্রয়োগ হয়ে থাকে, যা আদৌ শুদ্ধ নয়। যেমন ঃ-

১নং প্রক্রিয়া

হাদীসের অর্থ সহীহ, তাই হাদীস সহীহ।

এমন অনেক হাদীস আছে, যা যে কোন কারণে যয়ীফ। কিন্তু তার অর্থ সহীহ। কিন্তু তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি সম্পৃক্ত করা সঠিক নয়। যেহেতু প্রত্যেক সেই কথা, যার অর্থ সহীহ, সেটাই তিনি বলেছেন, তা নয়।

২নং প্রক্রিয়া

অভিজ্ঞতা দ্বারা হাদীসকে সহীহ ধারণা করা।

কোন একটি যয়ীফ হাদীসের দুআ কবুল হয়েছে, বিধায় হাদীসটি সহীহ, তা নয়।

কোন একটি যয়ীফ হাদীসের চিকিৎসা সফল প্রমাণিত হলে হাদীসটি সহীহ, তা নয়।

কোন একটি যয়ীফ হাদীসের ভবিষ্যদ্‌বাণী বাস্তব প্রমাণিত হলে, হাদীসটি সহীহ, তা হয় না।

৩নং প্রক্রিয়া

কাশ্‌ফ দ্বারা হাদীস সহীহ ধারণা করা।

স্বপ্ন বা কাশ্‌ফ দ্বারা যয়ীফ হাদীসকে সহীহ জ্ঞান করা সঠিক নয়। সূফীবাদীদের এটি অন্যতম আবিষ্কার।

৪নং প্রক্রিয়া

উলামাগণের গ্রহণযোগ্যতা দেখে হাদীসকে সহীহ জ্ঞান করা।

অনেক উলামা বা অধিকাংশ উলামা যয়ীফ হাদীস গ্রহণ করলেই তা সহীহ হয়ে যায় না। যতক্ষণ না সহীহ হওয়ার শর্তাবলী পাওয়া যায়। অবশ্য ইজমা হলে ভিন্ন কথা। তবুও সে ক্ষেত্রে সে উক্তিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি সম্পৃক্ত করা যাবে না। ইজমা হিসাবে তার অর্থ মান্য হবে, সহীহ হাদীস বলে নয়।

৫নং প্রক্রিয়া

কোন যয়ীফ হাদীসের উক্তিকে শরীয়তের মৌলিক নীতি বা কুরআনের কোন আয়াত সমর্থন করলে তা সহীহ জ্ঞান করা।

এ ক্ষেত্রে যয়ীফ হাদীসকে আমল দেওয়ার কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। শরীয়তের মৌলিক নীতি বা কুরআনের আয়াতের উপরেই আমল যথেষ্ট।

দ্বিতীয়তঃ যে প্রক্রিয়াতে হাদীসকে 'যয়ীফ' সাব্যস্ত করা সঠিক নয়।

১নং প্রক্রিয়া

হাদীসের উক্তিতে আজগুবি ও বিস্ময়কর কথা থাকলে হাদীসকে 'যয়ীফ' জ্ঞান করা।

সহীহ হওয়ার সকল শর্ত পূরণ হওয়ার পরেও এমন প্রক্রিয়া প্রয়োগ ক'রে হাদীসকে যয়ীফ ধারণা করা সঠিক নয়। অবশ্য অন্য ত্রুটির সাথে এটাকে অতিরিক্ত একটা ত্রুটি অবশ্যই গণ্য করা যায়।

২নং প্রক্রিয়া

কিয়াসের প্রতিকূল হলে হাদীসকে যয়ীফ জ্ঞান করা।

আসলে কোন সহীহ হাদীস কিয়াসের প্রতিকূল হতে পারে না। এমন হলে জানতে হবে কিয়াসের মধ্যে কোন ত্রুটি আছে।

৩নং প্রক্রিয়া

হাদীসের উক্তি জ্ঞান-বিবেকের বিরোধী মনে হলে যয়ীফ ধারণা করা।

কোনও সহীহ হাদীস জ্ঞান-বিবেকের প্রতিকূল হতে পারে না। এমন হলে জানতে হবে জ্ঞান বা বিবেক অসুস্থ অথবা দুর্বল।

আহলে হাদীসের নীতি নয়, সহীহ হাদীসের উপর জ্ঞান বা বিবেককে প্রাধান্য দেওয়া। বরং এ নীতি হল মু'তাযিলা ও প্রবৃত্তিপূজারীদের। যারা নিজেদেরকে 'জ্ঞানী' মনে ক'রে কুরআনের আয়াতের অপব্যাখ্যা করে অথবা সহীহ হাদীসকে যয়ীফ জ্ঞান করে।

৪নং প্রক্রিয়া

সর্বজনীন কোন ঘটনার বর্ণনাকারী একাকী হলে হাদীসকে যয়ীফ জ্ঞান করা।

যে ঘটনা একাধিক বর্ণনাকারীর বর্ণনা করার কথা ছিল, সে ঘটনা মাত্র একজন নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী বর্ণনা করলে, তা যয়ীফ হবে, এমন ধারণা সঠিক নয়। তাহলে তো বহু সহীহ হাদীস যয়ীফ হয়ে যাবে।

'প্রত্যেক আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল।' প্রত্যেক মানুষের নিয়ত প্রয়োজন। কিন্তু এর সর্বজনীনতা থাকা সত্ত্বেও সহীহ সূত্রে মাত্র একজন বর্ণনাকারী আছেন। তাহলে সেটাও কি যয়ীফ হবে? আদৌ না।

৫নং প্রক্রিয়া

উক্তি কুরআনের আয়াত অথবা প্রসিদ্ধ সহীহ হাদীসের বিরোধী হলে হাদীসকে যয়ীফ ধারণা করা।

এমনটা হতেই পারে না। বাহ্যতঃ তা মনে হলেও বাস্তবে তার সমন্বয় সাধনের ব্যবস্থা আছে। আর সে পদ্ধতি অন্যত্র উল্লিখিত হয়েছে।

৬নং প্রক্রিয়া

বর্ণনাকারীর রায় বিপরীত হওয়ার কারণে হাদীসকে যয়ীফ ধারণা করা।

প্রথমতঃ সে রায় বা ফতোয়া সহীহ সূত্রে বর্ণিত হবে। আর সহীহ সূত্রে বর্ণিত হলে এবং বিপরীত মত গ্রহণ করার কারণ অজানা থাকলেও এ ব্যাপারে মৌলিক নীতি হল, বর্ণনকারীর ফতোয়াকে প্রাধান্য না দিয়ে তাঁর বর্ণিত

হাদীসকে প্রাধান্য দিতে হবে।

৭নং প্রক্রিয়া

প্রসিদ্ধ হাদীসগ্রন্থসমূহে উল্লিখিত হয়নি বলে, হাদীসকে যয়ীফ ধারণা করা।

আসলে হাদীস সহীহ-যয়ীফের শর্তের মধ্যে এটি পড়ে না। এমন অনেক হাদীস আছে, যা প্রসিদ্ধ কোন হাদীসগ্রন্থে আসে নি, আর তার মানে এই নয় যে, হাদীসটি যয়ীফ। বরং অপ্রসিদ্ধ বহু গ্রন্থেও সহীহ হাদীস বর্তমান আছে। মুহাদ্দিসীনগণ তা চয়ন ক'রে থাকেন।

সমাপ্ত